যুগসন্ধির স্মৃতি
১৯৩০—৪৭

নির্মল রায়চৌধুরী

YUGASANDHIR SMRITI

by

Nirmal Roychowdhury

প্রকাশক

সাথী রায়চৌধুরী

২২ সি, সাউথ সিঁথি রোড

কলকাতা-৭০০ ০৫০

মুদ্রক

বিষ্ণু মজুমদার

রেনেসাঁ প্রিণ্টার্স,

১/৫/১এ, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০১২

প্রচ্ছদ

তরুণ পাইন

প্রথম প্রকাশ

২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৫

যাঁর হাত ধরে এ পথের পথিক হয়েছি
আমার মা
প্রয়াত শৈলবালাদেবীর স্মৃতির উদ্দেশে।

লেখকের নিবেদন

"বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি
এসো এসো সুরে করুণ মিনতি মাখা"

জীবনে নানা অধ্যায়কে পেছনে ফেলে আজ এসে দাঁড়িয়েছি জীবন সায়াহ্নে। মনের মধ্যে এসে ভীড় করেছে কত স্মৃতি, কত ঘটনা ও কত বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। কিন্তু সবচেয়ে বেশী করে যা মনে পড়ছে তাহলো আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেইসব রক্তঝরা দিনগুলির কথা।

যুগসন্ধির স্মৃতি কোন আত্মজীবনী নয়। আত্মজীবনী লেখার মত কেউকেটা নই আমি। একজন সাধারণ কর্মীর জীবনে এমন কোন বিশেষ ঘটনা ঘটেনি যা সবাইকে জানাতে হবে। এটা কোন ধারাবাহিক ইতিহাসও নয়। তবে সে সময় ছাত্রাবস্থায় যে রাজনৈতিক দলের একজন কর্মী হিসাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলাম সে দল ও ছাত্র আন্দোলনের কথা এখানে কিছুটা প্রাধান্য পেয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ের একটি ভগ্নাংশের সঙ্গে যুক্ত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেই সূত্রেই নানা ধরণের ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হয়েছিলাম। দেখেছি কত মানুষকে। "যারা শুধু দিয়ে গেল পেলনা কিছুই"। ইতিহাসে তাঁদের কোন স্থান নেই। কিন্তু নেপথ্য থেকে তাঁরাই সৃষ্টি করে গেছেন ইতিহাসকে।

যাত্রাপথের নিরুদ্দিষ্ট সেই মানুষগুলোর কথা বলতে বসেছি আজ স্বাধীনোত্তর নূতন প্রজন্মের কাছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ এবং তীব্রতর অধ্যায়টি ছিল চল্লিশের দশক। সেই বিশেষ কালপর্বের একটি খণ্ডিত ইতিবৃত্তকে এখানে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

কিছু ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ আছে। তা এজন্য নয় যে, এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ করেছি এজন্য যে হয়ত ঐ ঘটনাটি সেই যুগটাকে বুঝতে কিছুটা সাহায্য করবে। জানিনা এই বই পাঠকের ভাল লাগবে কিনা।

যদিও চল্লিশের দশকই এখানে মুখ্য। কিন্তু শুরু হয়েছে ১৯৩০ সাল থেকে। আমি তখন একজন বালক মাত্র। ১৯৩০-৩২ সালে গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের

অফিসে, স্কুলে, মদ-গাঁজার দোকানে পিকেটিং, পুলিশের লাঠিচার্জ, গ্রেপ্তার, বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিপ্লবীদের অসম সাহসিক কার্যকলাপ বালক মনে সৃষ্টি করেছিল এক অবাক বিস্ময়ের শিহরণ।

ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে যাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে নিজের স্মৃতিকে ঝালিয়ে নিয়েছি তাঁদের মধ্যে অন্যতম আমার অগ্রজ স্বাধীনতা সংগ্রামী বিমল রায়চৌধুরী, পরিমল সরকার, প্রবীণ বিপ্লবী নির্মল সেন, প্রবীর ঘোষ ও সে সময়ের অন্যতম ছাত্রনেতা ত্রিবেণী বর্দ্ধন।

পাণ্ডুলিপি অবস্থায় যাঁরা কিছু কিছু অংশ পাঠ করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম জগজীবন মজুমদার, চিরঞ্জীব মজুমদার, ডঃ অশোক বিশ্বাস, বিজু সেন। তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের অভিমত দিয়ে আমাকে সাহায্য ও উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের সবাইকে জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

১৯৪৫ সালের ২১শে নভেম্বর থেকে ২৪শে নভেম্বর পর্য্যন্ত ঘটনাবলী পি. এস. ইউ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকাটি থেকে গ্রহণ করেছি। (পুস্তিকাটি ১৯৮৫ সালের ২১শে নভেম্বর শহীদ রামেশ্বর ব্যানার্জীর স্মরণে প্রকাশিত হয়েছিল।) বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রফেডারেশনের (১৮নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট) উত্তরসূরী পি. এস. ইউ-কে জানাই আমার বিপ্লবী অভিনন্দন।

আমার প্রীতিভাজন তরুণ বুদ্ধিজীবি অধ্যাপক ডঃ রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের ক্রমাগত তাড়া, উৎসহ ও আন্তরিক সহযোগীতা না পেলে এ লেখা কোনদিনই সম্ভব হয়ে উঠত না। ছাত্রজীবনের বন্ধু রূপক গুহ ও পরবর্তীকালের সহকর্মী সুবোধ পোদ্দার কিছু তথ্য ও মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন। অনেক ধৈর্য্য ধরে সমস্ত লেখাটি প্রেসের উপযোগী করে লিখে দিয়েছে শ্রীমতী চিত্রা রায়চৌধুরী। প্রুফ দেখে সাহায্য করেছেন শ্রীমান নিমাই পাত্র ও শ্যামল চ্যাটার্জী। এদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমার যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তাতে ধন্যবাদ জানাবার প্রশ্ন ওঠে না।

নির্মল রায়চৌধুরী

২৫শে বৈশাখ ১৩৯৫

২২সি, সাউথ সিঁথি রোড

কলিকাতা-৭০০০৫০

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূচনাপর্ব

অতীতের ঝরাপাতায়

সেদিনের কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। খেলা করছিলাম কয়েকজন ছেলে মিলে দক্ষিণের বাড়ীর দুর্গা-মণ্ডপে। এমন সময় দূর থেকে একটা কান্নার শব্দ ভেসে এল কানে। এটুক পরেই একটি ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আমাকে তক্ষুনি বাড়ী যেতে বলল। বহু লোক নাকি ভীড় করেছে আমাদের বাড়ীতে এবং ঠাকুমা ভীষণভাবে কান্নাকাটি করছেন।

আমার মনে হল নিশ্চয় বাড়ীতে নূতন কেউ এসেছে তাই ঠাকুমা বাবার কথা মনে করে কান্না শুরু করেছেন।

কয়েক বছর আগে বাবার মৃত্যু হয়। ঠাকুমার একমাত্র পুত্র সন্তান। বাবার মৃত্যুর সময় আমার বয়স ছিল এক বছর। একটু বোঝার মত বয়স হলেই দেখতাম ঠাকুমাকে প্রায় প্রতিদিনই তাঁর মৃত পুত্রের কথা মনে করে কাঁদতে। বাড়ীতে কোন আত্মীয়স্বজন এলে সেটা আরও বেড়ে যেত। ঠাকুমার সঙ্গে আমিও কাঁদতে শুরু করতাম। আমার চার-পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত এটাই ছিল প্রায় প্রতিদিনের স্বাভাবিক ঘটনা। একটা শোকাতুর পরিবেশে আমার বাল্যকাল কেটেছে। ঠাকুমার ঐ কান্না স্বাভাবিক ধরে নিয়ে আবার ফিরে এলাম খেলার জগতে।

কিছু সময় যেতে না যেতে আবার একজন ছেলে এসে আমাকে বাড়ী যেতে বলল কারণ বড়দার খবর পাওয়া গেছে। পনের দিনের উপর বড়দা নিরুদ্দেশ। বাড়ীতে সবাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তাঁর খবর পাওয়ার পরেই নাকি ঠাকুমার এই কান্না। কথাটা শুনেই এক দৌড়ে

বাড়ীতে গেলাম। গিয়ে দেখি বড় ঘরের বারান্দায় ঠাকুমা শুয়ে উচ্চস্বরে আর্তনাদ করছেন। বহু লোক তাঁকে ঘিরে বসে রয়েছে। মা এক কোণে বসে নীরবে চোখের জল ফেলছেন। উপস্থিত সকলের চোখেই জল। পুত্রশোকাতুর সেই বৃদ্ধার মর্মভেদী আর্তনাদ বহু যু'গর এপার থেকে যেন আমি আজও শুনতে পাই।

বেশ খানিকটা সময়ের পর কান্নাকাটি থামলে সবাই মিলে ঠাকুমাকে ধরে বস'লেন। শুনতে পেলাম বড়দার নিরুদ্দেশের সংবাদ। দাদু (অমূল্য রায়) বলে যাচ্ছেন যে গোপাল (বড়দার ডাক-নাম) কংগ্রেসের সত্যাগ্রহী হিসাবে কাঁথি (মেদিনীপুর) গেছে লবণ আইন অমান্য করতে।

১৯৩০ সাল। কয়েক মাস আগে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হবার পর শুরু হয়েছে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক ডাণ্ডী অভিযান। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সারা ভারতবর্ষ উদ্বেলিত। বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে গোলা-বারুদের গন্ধ।

কয়েক মাস আগে কলিকাতার মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে গোপন আড্ডায় ইংরেজের গোয়েন্দা বাহিনী অতর্কিতে হানা দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র সহ অনেক বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে। শুরু হয় মেছুয়াবাজার ষড়যন্ত্র মামলা।

ইতিমধ্যে চট্টগ্রামে মাষ্টারদার (সূর্য সেন) নেতৃত্বে বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে। এর কয়েকদিন পর জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে বৃটিশ সৈন্যের হয় ঐতিহাসিক যুদ্ধ।

বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা থেকে সত্যাগ্রহীরা সমবেত হয়েছেন কলিকাতায়, কাঁথিতে গিয়ে লবণ আইন অমান্য করবেন। বিক্রমপুর পরগণার হাঁসাড়া গ্রাম থেকে বিমল রায়চৌধুরী (বড়দা) ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন।

সত্যাগ্রহীদের উপর তখন চলছে পুলিশের লাঠি, গুলি, গরম জল ছিটিয়ে দেওয়া প্রভৃতি নানা ধরনের অত্যাচার। সত্যাগ্রহীদের উপর অত্যাচারের কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে গ্রাম-গ্রামান্তর পর্যন্ত। পুলিশের এই নির্মম অত্যাচারের হাত থেকে বড়দা জীবিত অবস্থায় ফিরতে পারবেন কিনা এই প্রশ্ন সবার মনে। সমস্ত গ্রামেই যেন একটা থম্‌থমে ভাব।

সেই দিনই লোক পাঠিয়ে দেওয়া হল ঢাকাতে আত্মীয়-স্বজনের কাছে বড়দার খবরের জন্য। দুই-তিন দিনের মধ্যে সংবাদ আসল যে কলিকাতার কাছে বেলুড়ে সত্যাগ্রহীদের ক্যাম্প-এ বড়দা আছেন।

আমার কাকা (ঠাকুমার পালিত পুত্র) তখন কলিকাতায় থাকতেন। বড়দা বেলুড় ক্যাম্পে আছে এই মর্মে তাঁকে এক টেলিগ্রাম করে দেওয়া হল। তিনি খুঁজতে খুঁজতে বেলুড় ক্যাম্পে গিয়ে জানতে পারলেন, সত্যাগ্রহীরা কলিকাতায় বিডন স্কোয়ারে গেছে এক সভায় যোগ দিতে। বিডন স্কোয়ারে এসে কাকা জানতে পারেন যে কিছুক্ষণ আগেই জনসভায় উপর পুলিশের লাঠিচার্জের পর সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করে জোড়াবাগান থানায় নিয়ে গেছে। এরপর তিনি সেখানে গিয়ে দেখতে পান, লক্‌-আপে স্থানাভাবের জন্য কয়েক শত লোককে থানা কম্পাউণ্ডে বসিয়ে রাখা হয়েছে। কাকা ও সি-র সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিচয় দিলে তিনি তক্ষুনি বড়দাকে নিয়ে বাড়ী চলে যেতে বলেন। এরপর বড়দাকে বাড়ীতে এনে ঠাকুরদার (রেবতীমোহন রায়চৌধুরী) ঘরে তালাবন্ধ করে রাখা হল, যাতে আর বাড়ী থেকে পালাতে না পারেন। তাঁর বয়স তখন মাত্র ষোল বছর। ঠাকুরদা ছিলেন হবিগঞ্জ (শ্রীহট্ট) স্কুলের হেড পণ্ডিত। সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ তাঁর দখল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের দরুন তাঁর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হলে হবিগঞ্জ ছেড়ে এসে সেখানে আর ফিরে যাননি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান নায়ক প্রয়াত বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে

তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিপিন পালের সঙ্গে তোলা গ্রুপ ফটো আমাদের দেখাতেন।

বড়দা বন্ধ ঘরে ঠাকুরদার বিশাল ভুঁড়িতে মাথা রেখে তাঁর কাছে কেবল আবদার করতেন, কাকাকে বলে যেন তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। বলতেন, আমাকে এ ভাবে ঘরে আটকে রাখা যে কী অন্যায় তুমি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী হয়ে বুঝতে পার না? এর পরই হাঁউ হাঁউ করে কান্না জুড়ে দিতেন। ঠাকুরদা তখন ছড়া ও গল্প শুনিয়ে তাঁকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন। সেই সময় তিনি তাঁর একমাত্র পৌত্র শ্রীমান অমলের নামে ছড়া রচনা করেছিলেন। বড়দাকে বলতেন, ছড়াতে তোমারও নাম আছে। "বিমলের ছোট ভাই অমলেন্দু রায়, সুধাদিদি নাম রাখেন সুধার ভাষায়।" "জ্যাঠাইমা নাম রাখেন চিত্তরঞ্জন রায়, দেশভক্ত হবে শিশু চিত্তে দিয়ে সায়।" কিন্তু এত করেও বড়দাকে আটকাতে না পেরে একদিন ঠাকুরদা কাকাকে ডেকে বললেন, 'তোমরা আত (হাত) বান্‌বা পাও বান্‌বা কিন্তু মন বান্‌বা কই। দাদুরে ছাইরা দেও। একদিন দেখবা অর লাইগ্যা আমাগো বুক দশ হাত ফুইল্যা উঠব।' শেষ পর্যন্ত কাকা বড়দাকে ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে বিস্তারিতভাবে জানিয়ে চিঠি দিলেন। ইতিমধ্যে ছাড়া পেয়ে বেলুড় ক্যাম্পে এসে বড়দা অন্যান্য সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে রওয়ানা হয়ে যান কাঁথির উদ্দেশ্যে। সেখানে প্রখ্যাত গান্ধীবাদী নেতা ক্ষিতীশ রায়চৌধুরী সহ কয়েকশত সত্যাগ্রহীর সঙ্গে কারাবরণ করেন। এরপর সরকার থেকে সবাইকে পাঠিয়ে দেয় কণ্টাই সাব-জেলে। কিন্তু জেলখানায় স্থানাভাবের জন্য অধিকাংশ সত্যাগ্রহীকেই পনর দিন পর ছেড়ে দেয়।

বড়দা বাড়ী ফিরে আসল

প্রায় এক মাসের উপর কেটে গেছে। একদিন বাজার ফেরত লোকের মুখে শুনতে পেলাম বড়দা গ্রামে এসেছে। খবর পাওয়ার পর বাড়ীতে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি

বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন। পরনে খদ্দরের পাঞ্জাবী ও ধুতি, মাথায় গান্ধীটুপি, পায়ে চপ্পল। একেবারে অহিংস সত্যাগ্রহীর বেশ। ঝড়ের বেগে পাড়ায় পাড়ায় তাঁর আগমনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। অনেকটা যেন "গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটে গেল ক্রমে"। সারাদিন মানুষের আনাগোনার বিরাম ছিল না। নিস্তব্ধ হয়ে তাঁর কাছে সবাই শুনতে লাগল ইংরেজের লাঠি, গুলি ও নানা অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অহিংস জনতার এক মৃত্যুভয়হীন সংগ্রামের কাহিনী।

'গান্ধীর সজ্জিত বিরাট বাহিনী'

একদিন জানতে পারলাম হাঁসাড়া ও আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের মিলিত জনসভা হবে মুন্সী বাড়ীর মাঠে। বিকালের দিকে বিভিন্ন পাড়া থেকে বহু লোক মিলিত হলো আমাদের বাড়ীর খেলার মাঠের শেষপ্রান্তে অবস্থিত নন্দ মণ্ডলের বাড়ীর কাছে বটগাছের নীচে। 'বন্দেমাতরম্' ও 'গান্ধীজী কি জয়' ধ্বনি দিয়ে মিছিল শুরু হল। নন্দর বাড়ী পিছনে ফেলে কালীকুমার পণ্ডিতের পাঠশালাকে ডাইনে রেখে মিছিল এগিয়ে চলল মুন্সীবাড়ীর মাঠের দিকে। মিছিলের সামনে দাঁড়িয়ে ফুটুদা (রবি বসু) ও পাশে হীরালাল ঠাকুর। সমবেত কণ্ঠে গান শুরু হল। "গান্ধীর সজ্জিত বিরাট বাহিনী / নির্ভয়ে চলেছে বাধা নাহি মানি" মায়ের হাত ধরে আমিও হাঁটছি মিছিলের সঙ্গে। মিছিল এসে পড়ল তার গন্তব্যস্থানে। দেখতে পেলাম অনেক ছোট বড় মিছিল আসছে বিভিন্ন গ্রাম থেকে। তাদের হাতে ছিল তেরঙা ঝাণ্ডা ও কণ্ঠে চলেছে সেই গান। শতকণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্, লবণ আইন ভাঙতে হবে, স্বাধীনতা আনতে হবে, গান্ধীজী কি জয়' ধ্বনি দিয়ে সভার কাজ শুরু হল। সেই দিনের মিছিলের সেই গান এবং সমবেত কণ্ঠের স্লোগানগুলি গেঁথে গেল আমার হৃদয়ের অন্তরতম স্থলে। উপ্ত হল বাল্যবয়সেই আমার মনে ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ।

হাঁসাড়া গ্রাম

বিক্রমপুর পরগণার অন্যতম বৃহৎ গ্রাম হাঁসাড়া। তিন ভাগে বিভক্ত। পূর্ব হাঁসাড়া, পশ্চিম হাঁসাড়া ও নয়পাড়া। পশ্চিম হাঁসাড়ার অন্তর্গত ঢালীপাড়ায় মুসলমান সম্প্রদায়ের বাসস্থল। পশ্চিম হাঁসাড়ার মধ্যে দীঘির পারে অবস্থিত আলমগাজীর দরগা ধর্মনিরপেক্ষতার মূর্ত প্রতীক। প্রতিদিন অগণিত হিন্দু-মুসলমান নরনারী তাঁদের স্বামী পুত্র এবং আত্মীয়স্বজনের মঙ্গল কামনা করে দরগায় মানত করতেন। গ্রামের অধিবাসী ছিল বার হাজারের উপর। গ্রামের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে এক বিশাল খাল। পদ্মার তীর ভাগ্যকুল থেকে ধলেশ্বরীর তীর সোদপুর পর্যন্ত সংযোগ রক্ষা করে চলেছে, গ্রামের অর্থনীতিতে এই খালের গুরুত্ব অনেকখানি। ঢাকা থেকে ভাগ্যকুল পর্যন্ত প্রতিদিন বয়ে চলেছে অসংখ্য নৌকা, ধান, চাল, পাট, মাছ প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার নিয়ে। এছাড়া অসংখ্য যাত্রীবাহী নৌকা চলত এখান দিয়ে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ভাগ্যকুল, শ্রীনগর, ষোলঘর প্রভৃতি গ্রামের গয়নার নৌকা এই খাল দিয়েই যাতায়াত করত। ঢাকাগামী যাত্রীদের উদ্দেশ্যে গয়না নৌকার মাঝিদের উদাত্ত কণ্ঠের ডাক—ঢাকা-ঢাকা-ঢাকা ঐ—রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে গানের কলির মত আমাদের কানে ভেসে আসত।

আমাদের গ্রাম থেকে তুই মাইল দূরে একটি ছোট গ্রাম পুটিমারা। মাত্র কয়েক ঘর মুসলমান কৃষিজীবী বসবাস করত। এখান থেকে শুরু হয়েছে বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ আড়িঅল বিল। দিগন্ত-বিস্তৃত তুরন্ত নির্জন বিলের প্রাকৃতিক দৃশ্য ছিল মনোরম। অনেক সময় বিপ্লবীরা আড়িঅল বিলের নির্জনতাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের অনুশীলন চালিয়ে যেতেন। এর ফলে ইংরেজের গোয়েন্দা বিভাগের খাতায় এই বিলের কথা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। হাঁসাড়া গ্রামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য

ছিল বর্ণহিন্দুদের সংখ্যাধিক্য। অধিকাংশই ছিল চাকুরীজীবী, যদিও ডাক্তারী, ওকালতি প্রভৃতি পেশাতে নিযুক্ত ছিলেন কিছু সংখ্যক লোক। এঁদের অধিকাংশই ছড়িয়ে ছিলেন অবিভক্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত সীমায়, বিশেষ ভাবে কলিকাতায়। গ্রামে থাকত পরিবারের একাংশ। তারা নির্ভরশীল ছিল মানি-অর্ডারের উপর। অবশ্য জমির উপরও নির্ভর করত কিছু লোক। অবিভক্ত বাংলার কয়েকজন শিল্পপতি (বঙ্গশ্রী, শ্রীদুর্গা কটন মিল-এর প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ইউনিয়ন ড্রাগ-এর প্রতিষ্ঠাতা বি. এন. ঘোষ ইত্যাদি) এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এ ছাড়াও আরও অনেক বিখ্যাত ব্যাক্তি এই গ্রামেরই বাসিন্দা ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের পিতৃপুরুষের স্মৃতি বিজড়িত এই গ্রাম গ্রামের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত কালীকিশোর সেন হাইস্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৯ সালে। সেই যুগে ছাত্রসংখ্যা ছিল পাঁচশতের মত। এখান থেকে পরবর্তীকালে বেরিয়ে এসেছিলেন বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী। যথা শান্তি সোম, পরিমল সরকার, ধীরেন ঘোষাল চুণীলাল সোম, বিমল রায়চৌধুরী, দ্বিজেন গাঙ্গুলী প্রভৃতি। সেই সময়ের অন্যতম বিপ্লবী দল "শ্রীসঙ্ঘ"-এর বিশিষ্ট কর্মী ভবেশ ঘোষ ও অসিত ঘোষ দুই ভাই ছিলেন হাঁসাড়া গ্রামেরই সন্তান। মধ্যবিত্ত প্রাধান্যের দরুন গ্রামের হাওয়া ছিল সংস্কৃতির অনুকূলে। গ্রামে ছিল দুটি পাঠাগার (পাবলিক লাইব্রেরী) ও শখের থিয়েটারের দল। তারা প্রতিবছর দুর্গাপূজার সময় বা কিছু পরে নাট্যানুষ্ঠান করত। একবার বাড়ীর দুর্গামণ্ডপে অনুষ্ঠিত 'সীতা' নাটকের একটা দৃশ্য এখনও যেন আমার চোখে ভেসে উঠছে। রামের ভূমিকায় চুণীলাল সোম। চুণীদা উদাত্ত কণ্ঠে শিশির ভাদুড়ীর ঢঙে অভিনয় করে চলেছেন—"প্রজানুরঞ্জন, প্রজানুরঞ্জন / যার তরে আমার জানকীরে—আমার সীতারে দিনু বিসর্জন।" মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে অগণিত দর্শক।

'স্বরাজ কি পাইবো ?'

১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের অন্যতম কর্মসূচী ছিল মাদক দ্রব্য বর্জন। গ্রামের অদূরে মোহনগঞ্জের হাটে একটি দেশী মদের ও একটি গাঁজার দোকান ছিল। ১৪৪ ধারা জারি হল ঐ দোকানের সামনে। কর্মীরা ১৪৪ ধারা ভেঙে পিকেটিং চালিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পুলিশ এসে লাঠি চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে সত্যাগ্রহীদের। বড়দা তখন পিকেটিং সংগঠিত করার কাজে ব্যস্ত এবং নিজেও মাঝে মাঝে পিকেটিং-এ অংশগ্রহণ করতেন। এই আন্দোলন প্রচুর জনসমর্থন লাভ করলেও একদল নেশাখোর কিন্তু খুব বিমর্ষ হয়ে পড়ল। তার মধ্যে ছিলেন আমাদের এক জ্যাঠামশাই। বহুদিন চেষ্টার পর কিছু গাঁজা সংগ্রহে সমর্থ হয়ে জ্যাঠা তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে সন্ধ্যার পর বারান্দায় বসেছেন। তিনি তাঁর এক সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'কিরে অমইর্‌্যা, গাঁজা আনতে পারছস্ ?' 'হ কর্তা, পারছি, এই ছ্যাখেন।' জ্যাঠা বলে উঠলেন, 'তুই ব্যাটা কোন কামের না। আমি যাইতে পারলে তোরা ছ্যাখতি গাঁজার পরিমাণ আরও কত বেশী আইত। কিন্তু আমাগো গোপাইল্যা কাঁথির থিকা ফিরা আইয়া আবার গাঁজার দোকানের সামনে পিকেটিং করতে আছে। আমি যাই ক্যামনে, তোরাই ক ' এরপর জ্যাঠা বাঁ হাতের তালুতে গাঁজা রেখে ডান হাত দিয়ে তৈরী করতে করতে সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'স্বরাজ কি পাইবো ? কিছুতেই পাইবো না।' সঙ্গীরাও সমস্বরে বলে উঠল, 'হ কর্তা, আমাগোও মনে হয় পাইবো না।' এরপর তিনি কল্‌কেতে লম্বা এক টান মেরে কল্‌কেটি সঙ্গীদের হাতে তুলে দেন। টানের শেষে সবাই ঝিমুতে শুরু করেছে। জ্যাঠা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'স্বরাজ বোলে পাইবো ? কিছুতেই তা পাইতে পারে না। তোরা বোধহয় জানস্ না গান্ধীর নিজেরই আছে দুইটা গাঁজা ও একটা মদের দোকান।'

স্কুলে পিকেটিং, গ্রেপ্তার ও দারোগার নৌকা ঘেরাও

১৯৩০ সালের আগষ্ট মাস। সকালবেলা থেকেই শুরু হয়েছে অল্প অল্প বৃষ্টি। বারান্দায় বসে কয়েকটি ছেলের সঙ্গে লুডো খেলছি এমন সময় শুনতে পেলাম বাজারের দিক থেকে ভেসে আসা বহুকণ্ঠের ধ্বনি ঃ বন্দে মাতরম্ মহাত্মা গান্ধী কি জয়! এরপরই দেখি কয়েকজন লোক ঝড়ের বেগে নৌকা চালিয়ে বাড়ীর ঘাটে এসে ত্বরিৎ গতিতে লাফিয়ে পড়ে মাকে বলল যে গোপালদা ও আরও একজনকে ইস্কুলে পিকেটিং করার জন্য গ্রেপ্তার করে দারোগার নৌকায় আটকে রেখেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে শ্রীনগর থানায় নিয়ে চলে যাবে। এক্ষুনি দুজনের মত যা খাবার আছে নিয়ে চলুন। মা কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবার নিয়ে নৌকায় উঠলে সঙ্গে সঙ্গে আমিও একলাফে নৌকায় উঠে পড়লাম। বাজারের সামনে দারোগার নৌকা বাঁধা ছিল। আমরা গিয়ে দেখতে পেলাম তিনদাঁড়ি নৌকা তরতর করে বহুদূর চলে গিয়েছে। এরপর আমাদের সঙ্গে আরও ২০/২৫টি নৌকা একত্র হয়ে অনুসরণ করতে করতে অবশেষে ঘোষের বাড়ীর সামনে দারোগার নৌকাকে ঘেরাও করে ফেলল। এরপর দারোগা লতিফসাহেব নৌকা থেকে বেরিয়ে আসলে সমবেত জনতা সত্যাগ্রহীদের খেতে সময় দেবার জন্য দাবী করতে থাকে।

মা দারোগাকে বাজারের ঘাটে সামান্য সময় অপেক্ষা না করার জন্য বাক্যবাণে জর্জরিত করে তুললেন এবং জনতার প্রচণ্ড চাপে দারোগা লতিফসাহেব হাতকড়া খুলে দিতে বাধ্য হলেন। খাওয়া শেষ হলে বড়দা ও তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে লতিফসাহেবের নৌকা এগিয়ে চলল শ্রীনগর থানার দিকে। শতকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল, 'বন্দে মাতরম্, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক!' আমরাও তখন রওয়ানা হলাম বাড়ীর পথে।

ক্রমে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি এসে গেল। একটু পরেই মুষলধারে ঝম্‌ঝম্ শব্দে বৃষ্টি শুরু হল। "থম্‌থমে রাত্রির ঝম্‌ঝমে বৃষ্টি, ডুবল

কি পথঘাট ডুবল কি সৃষ্টি।” ঐ শব্দ শুনতে শুনতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

দুই-তিন দিন পর খবর আসল যে বড়দা ও তাঁর বন্ধুকে মুন্সীগঞ্জ মহকুমা আদালত থেকে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। মা শুনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, “এতদিনে আমি নিশ্চিন্ত অইলাম। গোপাল আর বাড়ী ছাইর‍্যা আনেবানে ঘুইর‍্যা বেড়াইতে পারবো না।”

লোম্যান ও হডসনকে গুলি করা হল

একদিন হঠাৎ খবর পেলাম যে ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে লোম্যান ও হডসন নামে দুজন বড় ইংরেজ পুলিশ-অফিসারকে কোন এক অজ্ঞাতনামা যুবক গুলি করেছে। লোম্যান নিহত ও হডসনকে গুরুতরভাবে আহত করে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সে অদৃশ্য হয়ে যায়। পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই সংবাদে 'দ'বা গ্রামের মানুষই যেন আনন্দে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে পড়ল। কয়েকদিন পর জানা গেল এই পলাতক যুবকের নাম বিনয় বসু।

কে এই বিনয় বসু? ক্রমে জানতে পারলাম ইনি হচ্ছেন সেই বিনয় বসু যিনি গত জানুয়ারী মাসে জ্যোতিষ জোয়ারদার ও দীনেশ গুপ্তের সঙ্গে এসে আমাদের বাড়ীতে তিন দিন থেকে গ্রামের ছাত্র-যুবকদের প্যারেড করিয়ে গিয়েছিলেন।

জ্যোতিষ জোয়ারদার, বিনয় বসু ও দীনেশ গুপ্তের হাঁসাড়ায় আগমন

১৯৩০ সালে জানুয়ারী মাসে ঢাকা-ওয়াড়ীর কোন এক মাঠে বড়দা আমাদের পিসতুতো ভাই ননীদার (কালীপ্রসন্ন ঘোষ) সঙ্গে যান তাদের ক্লাবের প্যারেড দেখতে। সেখানে জ্যোতিষ জোয়ারদার, বিনয় বসু ও দীনেশ গুপ্ত সহ বহু যুবককে প্যারেড করাচ্ছিলেন। ঐ দেখে বড়দার খুব ভাল লাগল। প্যারেড শেষে ননীদা জ্যোতিষ

জোয়ারদারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে তিনি তাঁকে অনুরোধ করেন, তিনি হাঁসাড়াতে গিয়ে ছাত্র-যুবকদের প্যারেড করাতে পারবেন কিনা। শুনে জ্যোতিষ জোয়ারদার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দের সাথে রাজী হলেন। এরপর বড়দা বাড়ী চলে আসেন। কয়েকদিন পর জ্যোতিষ জোয়ারদার, বিনয় বসু ও দীনেশ গুপ্তকে নিয়ে ননীদা আমাদের বাড়ীতে আসেন। এটাই হল প্রয়াত নেতা জ্যোতিষ জোয়ারদার, শহীদ বিনয় বসু ও দীনেশ গুপ্তের হাঁসাড়া গ্রামে আসার পটভূমি।

আগের থেকেই সবাই প্রস্তুত ছিলেন। শুরু হল আমাদের বাড়ীর খেলার মাঠে প্রায় একশত ছাত্র ও যুবকদের এক অপূব প্যাবেড। মেজর জোয়ারদার তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে হাঁক দিচ্ছেন, 'এ্যাটেনশন', 'রাইট টার্ণ', 'লেফ্‌ট্‌-রাইট-লেফ্‌ট্‌'।

বহুযুগ পরে আজও আমার মানসপটে মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে ঐ প্যারেডের একটা অস্পষ্ট ছবি। এর কয়েকদিন পর ঢাকা থেকে অনুশীলন দলের নেতারা বড়দা সহ কয়েকজন কর্মীকে ডেকে পাঠালেন। বড়দা ছিলেন অনুশীলন দলের কর্মী। হাঁসাড়া গ্রামে ছিল ঐ দলের এক শক্ত ঘাঁটি। বিশিষ্ট নেতা শহীদ ধনেশ ভট্টাচার্য সবাইকে জিজ্ঞাসা করেন, কেন তারা অনুশীলনের সভ্য হয়েও বি. ভি. (বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স)-এর নেতাদের নিয়ে গেল? এই বলে ধনেশ ভট্টাচার্য তাঁর পেশীবহুল হাতে বড়দার গালে এক প্রচণ্ড চড় মারেন। বড়দার কাছে পরে শুনেছি যে এই ঘটনার জের চলেছিল প্রায় আধ ঘণ্টা।

১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বড়দা জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়ী আসেন। এবার গ্রামের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে গেল, যেটা শুরু হয়েছিল কাঁথি থেকে সত্যাগ্রহী হিসেবে ফিরে আসার পর। প্রায় দিনই গ্রামের কোন-না-কোন বাড়ীতে নিমন্ত্রণ পেতে লাগলেন। ঐ দেখে তাঁর এক বন্ধু বলেছিলেন, স্বয়ং গান্ধীজী আসলেও বোধহয় এর চেয়ে বেশী সমাদর লাভ করতেন না।

সেই সময় ওঁর কাছে জেলের সেপাই, জমাদার, সরকার সেলাম, নাপসি, পাগলা ঘন্টির গল্প শুনতে শুনতে জেল সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল।

১৯৩১ সালে গান্ধী আরুইন চুক্তি। কংগ্রেস নেতারা সহ সারা দেশের সত্যাগ্রহীদের মুক্তিলাভ

১৯৩১ সালের মার্চ মাস গান্ধী-আরুইন চুক্তির ফলে কংগ্রেস নেতৃবর্গসহ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সম্পর্কে ধৃত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু বাংলাদেশে বিনা বিচারে আটক বিপ্লবী দলের এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে ধৃত বন্দীরা কেউ মুক্তি পেলেন না। বাংলাদেশে বিপ্লবীদের প্রচণ্ড প্রয়াস এবং সেই সঙ্গে ইংরেজ সরকারের দমননীতি অব্যাহত গতিতে চলতে থাকল। এই সময় একদিন শুনলাম যে শান্তি সোমদের বাড়ী পুলিশ শেষ রাত্রি থেকে ঘেরাও করে অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধানে অনেক বেলা পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে খানা তল্লাসী করেছে। পুলিশ কিছুই পায়নি কিন্তু শান্তিদাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। এরপর তিনি ফিরে আসেন বহু জেল ও ডিটেন্শন্ ক্যাম্প ঘুরে ১৯৩৮ সালে।

গান্ধী-আরুইন চুক্তি অনুযায়ী আমাদের গ্রামের সত্যাগ্রহী বন্দীরাও একে একে ছাড়া পেয়ে ফিরে আসতে শুরু করেন।

আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ। কিন্তু অনুশীলন সমিতির সদস্যদের গোপন বৈঠকের বিরাম ছিল না। প্রায় দিনই দেখতাম বড়দাকে দাদুর (অমূল্য রায়) বাড়ীতে সন্ধ্যার পর যেতে। বিভিন্ন পাড়া এবং অন্যান্য গ্রামের লোকও প্রায়ই অমূল্য রায়ের কালীমণ্ডপে মিলিত হয়ে গভীর রাত্রে যে যার বাড়ীতে চলে যেতেন।

হাঁসাড়া তথা বিক্রমপুর পরগণার একজন প্রথম সারির নেতা ছিলেন চুণীলাল সোম। তাঁরই উদ্যোগে হাঁসাড়াতে অনুশীলন

সমিতির সংগঠন ছাত্র যুবকদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। নেতৃত্বের সব গুণই তাঁর ছিল। সুদর্শন, শিক্ষিত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা এবং প্রচণ্ড আকর্ষণী শক্তি। কিন্তু তিনি কয়েক বছরের মধ্যেই সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসন নিয়ে ক্রমে হারিয়ে গেলেন। এই রকম একজন সম্ভাবনাপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কেন স্বেচ্ছায় হারিয়ে গেলেন এ সম্বন্ধে বহু বছব পর অনেকের নিকট অনেক কথা শুনেছি। আমি মেনে নিতে পারিনি। শুধু তথ্য দিয়েই কি জানা যায় জীবনের সমস্ত সত্য ?

হাস্যরসিক অমূল্য মুখার্জী

একদিন বিকালের দিকে ষোলঘরের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ও অনুশীলন সমিতির সদস্য অমূল্য মুখার্জী আমাদের বাড়ীতে আসেন বড়দার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি বড়দাকে খুবই স্নেহ করতেন। অমূল্যদার নাম বহু শুনেছি বড়দার মুখে। খুবই দিলখোলা আড্ডাবাজ মানুষ। কয়েকদিন আগেই ঢাকা জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। গল্প করতে করতে বেশ রাত্রি হয়ে গেল। সবাই মিলে সেই রাত্র থেকে যাবার জন্য অনুরোধ করতে তিনি রাজী হন। রাত্রে সবাই খেতে বসেছি। সেদিন বাড়ীতে পাঁঠার মাংস রান্না করা হয়েছিল। মা জিজ্ঞাসা করলেন, অমূল্যবাবু মাংস খান কিনা। 'ব্রাহ্মণ মানুষ ত হাজার হউক।' উত্তরে তিনি বললেন, 'খাই না মানে ? তবে তোমরা সবাই শুন।' অমূল্যদা শুরু করলেন—'একদিন আমাগো বাড়ীতে কয়েকজন বন্ধু মিইল্যা মাংস খাওনের গল্প অইতেছিল। একজন বলে আমি পাঁঠার মাংস অইলে এক থালা ভাত খাই। আর একজন কইয়া উঠল যে তুই ত পাঁঠার মাংস দিয়া একথালা ভাত খাছ। আমি পাঁঠার মাংসের হাঁড়ির থিকা যে গন্ধ বাইর অয় সেই গন্ধ শুইঙ্গা এক থালা ভাত খাই। এই কথা শুইন্যা আর একজন কইল, আমি পাঁঠা যে বাইন্ধ্যা রাখে সেই পাঁঠারে দেইখ্যা দেইখ্যা একথালা ভাত খাই।

আর একজন কইল আমি পাঁঠার ডাক শুইন্যা একথালা ভাত খাই। শ্যাষে আর একজন কইয়া উঠল, তুই ত পাঁঠার ডাক শুইন্যা খাস। আমি আর দাদা খাইতে বইয়া, দাদা একবার ডাকে ব্যা, আমি একথালা ভাত খাই, আমি আবার ডাক দেই ব্যা—দাদা একথালা ভাত খায়।' অমূল্যদার গল্প শেষ হতে না হতেই প্রচণ্ড হাস্যরোলে খাবার ঘর ফেটে পড়ল। হাসতে হাসতে ছোড়দার বিষম লেগে গিয়েছিল।

অমূল্যদা ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। '৪২-এর আগষ্টে বিক্রমপুরে প্রচণ্ড বেগে যে আন্দোলন বয়ে গিয়েছিল অমূল্যদা ছিলেন তার অন্যতম প্রধান নেতা। সেপ্টেম্বর মাসে ষোলঘরের কোন এক বাড়ীতে হঠাৎ তাঁকে গ্রেপ্তার করে শ্রীনগর থানায় নিয়ে গেলে আন্দোলনকারীরা এবং হাটের সমবেত জনতা (সেদিন শ্রীনগরের হাট ছিল) থানায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে তাঁকে মুক্ত করে আনেন। এর পরই শুরু হয় তাঁর ফেরারী জীবন। ১৯৪৬ সালে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের পর তিনি আত্মপ্রকাশ করেন এবং দেশভাগের পর কলিকাতায় চলে আসতে বাধ্য হন। এখানে এসে তিনি ছিলেন হাওড়ার টিকিয়াপাড়ার এক বস্তিতে। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করে কয়েক বছর আগে মৃত্যু বরণ করেন।

ঘটনাবহুল ১৯৩২

১৯৩১ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স ব্যর্থ হওয়ার পর ২৮শে ডিসেম্বর গান্ধীজী বোম্বেতে পৌছানোর পর ৪ঠা জানুয়ারী (১৯৩২) তাঁকে ইংরেজ সরকার গ্রেপ্তার করে, এবং সেই সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসকেও বেআইনী ঘোষণা করা হয়। প্রতিবাদে শুরু হয় সারাদেশে হরতাল। সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য, খাজনাবন্ধ এবং স্বেচ্ছায় হাজার হাজার মানুষের কারাবরণ। বাংলাদেশের উপর নেমে আসে এণ্ডারসনী রাজত্বের "অত্যাচারের খড়্গ কৃপাণ"। বিপ্লবীরাও পিস্তলের মুখে তার সমুচিত জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন!

জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস

১৯৩২ সালের ১৩ই এপ্রিল 'জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস' উপলক্ষ্যে হাঁসাড়া কংগ্রেস কমিটি মুন্সীবাড়ীর মাঠে এক জনসভার ডাক দেয়। ছাত্র, যুবক, বালক, কিশোর ও মহিলাসহ অসংখ্য মানুষ মিছিল করে যাচ্ছে উক্ত সভাতে যোগ দিতে। সামনের সারিতে স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে ছোট ছোট চরকা-লাঞ্ছিত তেরঙ্গা পতাকা। আমিও একটা পতাকা হাতে মা-র পাশে পাশে হেঁটে চলেছি হীরালাল ঠাকুরের পরিচালনায় সমবেত কণ্ঠে গান গাইতে গাইতে—

"চল্‌রে চল্‌রে চল্‌রে ও ভাই জীবন-আহবে চল্‌
বেঁচে থেকে ভাই সুখ কি আছে
লাগুক জীবন দেশের কাজে।"

মাঝে মাঝে ধ্বনি উঠছে 'বন্দে মাতরম্‌', 'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক', 'চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ কর'।

"Up Up National Flag, Down Down Union Jack."

কেউ আবার বাংলায় ধ্বনি দিচ্ছিল—

"উঠুক উঠুক জাতীয় পতাকা—নত হউক যত বৃটিশের মাথা।" সমবেত কণ্ঠে গান ও শ্লোগান দিতে দিতে মিছিল এসে পৌছল মুন্সী বাড়ীর মাঠে। দেখি শ্রীনগর থানার বড় দারোগা সহ অসংখ্য লাল পাগড়ি মাঠে ঢুকে দাঁড়িয়ে আছে। দারোগা ঘোষণা করল, ১৪৪ ধারা জারী হয়েছে, কোন সভা করা চলবে না।

দারোগার কথা অগ্রাহ্য করে শুরু হল সভার কাজ। বড়দা বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন: '১৯১৯ সালের এই দিনে পাঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগ ময়দানে জনগণ সমবেত হয়েছেন তাঁদের প্রিয় নেতা সৈফুদ্দিন কিচলু ও সত্যপালের বহিষ্কারের প্রতিবাদ জানাতে। সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে অস্তমিত। এই সময় বৃটিশ জেনারেল ডায়ারের আদেশে—।' এই পর্যন্ত বলার পরই দারোগা কয়েকজন পুলিশের সাহায্যে বড়দাকে টানতে

টানতে মাঠের বাহিরে নিয়ে গেল এবং গ্রেপ্তার করা হল অনেক স্বেচ্ছাসেবককেও।

মুহূর্তে 'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক', 'স্বাধীনতা আনতে হবে', 'দেশের তরে মরতে হবে' প্রভৃতি ধ্বনি বহুকণ্ঠে গর্জে উঠে মুন্সীবাড়ীর মাঠ কাঁপিয়ে তুলল। এরপরই ধৃত ব্যক্তিদের নিয়ে পুলিশ বাহিনী রওয়ানা হল শ্রীনগর থানার পথে। আমরাও নানা ধ্বনি দিতে দিতে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলাম।

ঠাকুমার বকুনি

বাড়ী ফিরে এসে ঠাকুমাকে সব কথা বললাম। সব শোনার পর তিনি মাকে বকুনী শুরু করলেন, 'তোমারে মিটিং-এ যাইতে দিলাম পোলারে দেইখ্যা আননের লাইগ্যা। তুমি কোন আক্কেলে পোলারে রাইখ্যা বাড়ীতে আইলা?' ঠাকুমার কথা শুনে সবাই তুমুল হাসিতে ফেটে পড়ল।

পুলিশি কিল

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। অনেক রাত্রে ঘরে বহু মানুষের কথা শুনে জেগে উঠলাম। হঠাৎ কিছু বুঝে ওঠার আগেই কে যেন আমাকে বিছানা থেকে টেনে তুলে ঘাড়ের উপর প্রচণ্ড জোরে এক কিল মেরে বলে উঠল, 'এই হচ্ছে পুলিশি কিল।' চেয়ে দেখি বড়দা।

এরপর জানতে পারলাম যে স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রেপ্তারের পর শ্রীনগর থানার পথে ষোলঘর মহাশ্মশানের কাছে একদম ফাঁকা নির্জন দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মধ্যে দারোগার আদেশে পুলিশবাহিনী কারুর পিছনে কয়েক ঘা বেত কসিয়ে, কারুর ঘাড়ে প্রচণ্ড জোরে কিল মেরে বলল, 'যা ব্যাটারা, এইবার বাড়ীতে যা'। এরপর কয়েকদিন 'পুলিশি কিল' খেলায় মেতে উঠলাম। যখন-তখন যেখানে-সেখানে আমরা সমবয়সী ছেলেমেয়েদের ঘাড়ের উপর হঠাৎ খুব জোরে এক

কিল মেরে 'এই হচ্ছে পুলিশি কিল' বলে পালিয়ে যেতাম। এই জন্য মার কাছে অনেক অভিযোগ আসত। একদিন তাঁর হাতে ভীষণভাবে পাখাপিট্টি খাওয়ার পর খেলা বন্ধ হয়ে গেল।

এ ঘটনার মাত্র তিন-চারদিন পর মেজো পিসিমার বাড়ী বীরতারা থেকে ফেরার সময় গ্রামে ঢুকতেই জানতে পারলাম যে কিছুক্ষণ আগেই বড়দা সহ বহু স্বেচ্ছাসেবককে ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে পিকেটিং করার অভিযোগে নির্মমভাবে লাঠি চালনার পর গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অনেকেই প্রচণ্ডভাবে আহত হয়েছেন। এই সংবাদ শোনার পর আমি ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসের দিকে ছুটতে লাগলাম। গিয়ে দেখি অফিসের কাছে বহু লোক দাঁড়ানো। বন্ধ ঘরের মধ্য থেকে সমবেত কণ্ঠে ভেসে আসছে—

"তোরা বেত মেরে কি মা ভুলাবি / আমরা কি মার সেই ছেলে।
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি / কে পালাবে মা ফেলে?"

অল্প কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পেলাম সবাইকে হাতকড়া দিয়ে পুলিশ বাহিনী রওয়ানা হল শ্রীনগর থানার দিকে। এক সপ্তাহের মধ্যে বাড়ীতে খবর আসল বড়দা সহ সবাইকে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

কামাখ্য সেন হাঁসাড়ায় এলেন

১৯৩২ সালে শত শত মানুষের কারাদণ্ড, বাড়ীতে বাড়ীতে পুলিশের হানা, জরিমানা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত প্রভৃতি ব্যাপক অত্যাচার সত্ত্বেও বিক্রমপুরে আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করেছিল।

এই আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কামাখ্যা সেন শান্তি সোমদের বাড়ীর একাংশ দখল করে তাঁর শিবির স্থাপন করেন। হাঁসাড়া গ্রামের এই শিবিরকে কেন্দ্র করে তিনি প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়েন বিক্রমপুরে আন্দোলনকারীদের উপর। আন্দোলনের খবর পাওয়া মাত্র কামাখ্যা সেন ছুটে যেতেন পুলিশ বাহিনী নিয়ে।

নির্মম লাঠি চার্জে সত্যাগ্রহীদের দেহ ক্ষত বিক্ষত করে বিশেষ ক্ষমতাবলে সঙ্গে সঙ্গে বিচার করে দুই বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করতেন। মহিলা সত্যাগ্রহীরাও তাঁর অত্যাচার থেকে রেহাই পেতেন না। কামাখ্যা সেন তখন এক মূর্তিমান বিভীষিকা।

এই সময় অনুশীলন সমিতির কর্মী পরিমল সরকার (বিদ্যাদা) দলের নির্দেশে আত্মগোপন করেন আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য। তাঁকে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে শেষ রাত্রে পুলিশ তাঁদের বাড়ী ঘেরাও করে কয়েক ঘণ্টা ধরে খানা তল্লাসী চালায়। তারপর তাঁকে না পেয়ে দুইটি কাঁচের আলমারী সহ সমস্ত ঔষধের শিশি বোতল ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করে। বিদ্যাদার বাবা ডাঃ জলধর সরকার ছিলেন একজন জনপ্রিয় চিকিৎসক। নির্ভীক আদর্শবান দেশপ্রেমিক মানুষ। খানা তল্লাসের সময় ডাক্তার-বাবু কামাখ্যা সেনকে অনুরোধ করেছিলেন যে এনাস্‌থেসিয়া যন্ত্রটি যেন না ভাঙ্গেন। কয়েকটি গ্রামের মধ্যে কেবল তাঁরই কাছে আছে এই যন্ত্রটি। এটি নষ্ট হলে গ্রামের বহু মানুষ খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়বে। কামাখ্যা সেন তাঁকে দুই বৎসর কারাদণ্ড দেবার ভয় দেখালে ডাক্তারবাবু বলেন, আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। এরপর কামাখ্যা সেন অন্যান্য ঔষধ পত্রের সঙ্গে এনাস্‌থেসিয়া যন্ত্রটিও ভেঙ্গে ফেলে দেন।

কিছুদিন পরেই কামাখ্যা সেন তাঁর শিবির অন্যত্র নিয়ে চলে যান। তারপর কয়েক সপ্তাহ বাদে ঢাকা শহরে ঘুমন্ত অবস্থায় বিপ্লবীদের হাতে কামাখ্যা সেন নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে সারা বিক্রমপুরের মানুষ আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠল।

দারোগা প্রহৃত

ছোট্ট গ্রাম মোহনগঞ্জ। প্রতি শুক্রবার এখানে হাট বাসে। সেখানে ছিল একটি দেশী মদ ও গাঁজার দোকানের সঙ্গে কিছু পতিতা-লয়। আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচী হিসাবে সত্যাগ্রহীরা দোকা-নের সামনে পিকেটিং শুরু করলে একদিন শ্রীনগর থানার দারোগাবাবু

পিকেটিংকারীদের উপর প্রচণ্ড লাঠি চার্জের পর এক পতিতার ঘরে ঢুকল একটু বিশ্রাম নেবার জন্য। কিন্তু সেই পতিতা দারোগাকে মনোরঞ্জন করার অক্ষমতা জানালে সে ক্ষিপ্ত হয়ে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতে শুরু করে। এরপর উক্ত পতিতা কোনক্রমে তার ঘর থেকে বের হয়ে এসে অন্যান্য সঙ্গিনীদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে দারোগার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়। এ খবর রটে যাওয়ার পর হাটের ক্ষিপ্ত জনতা দারোগাকে উক্ত ঘরে বন্দী করে প্রচণ্ড প্রহার শুরু করে। উন্মত্ত জনতাকে দেখে সঙ্গের পুলিশবাহিনীও পালিয়ে যায়। এই সময় হাটে উপস্থিত গ্রামের কবিরাজ শ্রীশচন্দ্র সেন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে দারোগা তাঁর পাদুটি জড়িয়ে ধরে বলেন, 'আপনি আমার ধর্মের বাপ আমাকে বাঁচান।' কবিরাজ মশাই-এর অনুরোধে জনতা শান্ত হয়।

অসুস্থ অবস্থায় বড়দার মুক্তিলাভ

১৯৩২ সালের জুলাই মাসে অসুস্থ দিদিকে দেখার জন্য আমি মার সঙ্গে কলিকাতার উদ্দেশ্যে ভাগাকুলের পথে রওয়ানা হই। ভাগাকুল ষ্টীমার ঘাটে এসে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতেই দেখতে পেলাম গোয়ালন্দ ষ্টীমার ভোঁ--ও--ভোঁ---ও করতে করতে এগিয়ে আসছে। ষ্টীমারের এই জলদগম্ভীর শব্দ বহু দূর থেকে শোনা যায়।

ঐ শব্দের মধ্যেই আছে যেন এক সুদূরের আহ্বান। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ষ্টীমার এসে ভিড়ল বিশালকায় দুটি "ছান্দী নৌকা"র গায়ে। যাত্রী ও মালপত্র উঠানোর পর ষ্টীমার এসে পৌঁছালো গোয়ালন্দের ঘাটে দেড় ঘণ্টার মধ্যেই। গোয়ালন্দ এসে সে যুগের একটি ইন্টার ক্লাস কামরায় উঠে বসলাম। রাত্রি দশটার সময় ট্রেন ছেড়ে দিলে পরদিন ভোর বেলায় শিয়ালদা এসে পৌঁছালাম।

কলিকাতা আসার দুই তিন দিনের মধ্যেই আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি খবর পড়ে বাড়ীর সবাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। দুজন মুক্ত রাজবন্দী এক বিবৃতিতে জানাচ্ছেন যে ঢাকা জেলার হাঁসাড়া গ্রামের

অধিবাসী বিমল রায়চৌধুরী কিছুদিন যাবৎ টি. বি রোগে আক্রান্ত হয়ে জেল হাসপাতালে শয্যাশায়ী। গভর্নমেণ্ট অবিলম্বে তাঁকে মুক্তি দিয়ে চিকিৎসায় সুবন্দোবস্ত না করলে তাঁর জীবন সংশয় হয়ে উঠতে পারে। পরের দিনই মা দমদম জেলে বড়দাকে দেখার জন্য গেলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর দেখা করতে না পেরে নিরাশ হয়ে ফিরে আসেন। জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিলেন তিনি ভালই আছেন। ডাকযোগে সাক্ষাৎকারের দিন জানিয়ে দেওয়া হবে। সেই সময় ঐ জেলে বন্দী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জী, আবু হোসেন সরকার এবং ময়মনসিং-এর চারু রায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের এক যৌথ আবেদনপত্রে বিমল রায়চৌধুরীকে ছেড়ে দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

এরপর যে কোন কারণেই হউক, কর্তৃপক্ষ বড়দাকে মুক্তি দিলেন। একদিন সন্ধ্যার পর দেখলাম দুইজন জেল সেপাই সহ একজন গোয়েন্দা অফিসার বড়দাকে নিয়ে ডাঃ জগবন্ধু লেনের বাড়িতে এসে মাকে দিয়ে এই মর্মে সই করিয়ে নিলেন যে তাঁর পুত্রকে জীবিত অবস্থায় তিনি পেয়েছেন।

পরের দিনই মা দেখা করলেন শ্রীমতী অপর্ণা রায়ের সঙ্গে (দেশবন্ধুর কন্যা), কিভাবে বড়দার চিকিৎসা করা যায় তা আলোচনার উদ্দেশ্যে। হাঁসাড়ার চৌধুরী বাড়ীর বধূ হিসাবে দুইজনের মধ্যে বহুদিন থেকেই ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে চিঠি লিখে দিলে বড়দা তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। ডাঃ রায় পরীক্ষা করে বললেন, রোগটা খুব প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। সাবধান মত থাকলে ভাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। ইতিমধ্যে ঠাকুমার চিঠি পেয়ে আমরা বাড়ী ফিরে আসলাম। কয়েকদিনের মধ্যেই মা বড়দাকে নিয়ে ঢাকা চলে আসেন। এখানে সদরঘাটে বুড়ীগঙ্গার তীরে পিনিসে থেকে কবিরাজ শ্রীশচন্দ্র সেনকে দিয়ে চিকিৎসা করাবেন।

আত্মগোপন করে ননীদা হাঁসাড়াতে এলেন

বড়দা ঢাকা চলে যাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে একদিন হঠাৎ সন্ধ্যার দিকে ননীদা (পিসতুতো দাদা) পিসেমশাইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীতে এসে উপস্থিত হন। তিনি ছিলেন বি, ভি, দলের সদস্য।

এই সময় গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে আদেশ জারী করা ছিল যে, কোন বাড়ীতে ভিন্ন জায়গা থেকে ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়স পর্যন্ত যে কেউ আসুক না কেন, নিকটবর্তী থানা অথবা গ্রামের দফাদারকে তা জানাতে হবে। দফাদারও আসতো অনেক সময় ঐ খবর নিতে।

নিয়মানুযায়ী তারিণী দফাদার একদিন আমাদের বাড়ীতে এসে কাকিমাকে জিজ্ঞাসা করল নূতন কেউ এসেছেন কিনা। কাকিমার হঠাৎ কি মনে হওয়াতে বলে দিলেন যে কেউ আসেনি।

দুপুরের খাওয়ার সময় অন্যান্য কথার মধ্যে ঐ দফাদারের খোঁজ নেবার কথা বললে ননীদা ও পিসেমশাই খাওয়া ফেলে সঙ্গে সঙ্গে উঠে তাঁদের স্যুট্‌কেশ গোছাতে শুরু করে দিয়ে আমাদের বললেন যে এক্ষুনি একটা নৌকা ভাড়া করে এনে বাড়ীর পিছন দিকের ঘাটে যেন ভেড়ানো হয়। সামান্য একজন দফাদারের আসার খবর শুনে ঐভাবে বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য আমরা খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

কেন যে ননীদা সেদিন ঐভাবে চলে গিয়েছিলেন সেইকারণ জানতে পেরেছিলাম কয়েক বছর বাদে তাঁর দেউলী ডিটেন্‌শন্ ক্যাম্প থেকে মুক্তিলাভের পর।

হাঁসাড়া আসার প্রায় সপ্তাহ তিনেক আগে ননীদা ও ক্ষিতীশ মুখার্জী নামে তাঁর আর এক বন্ধু (যদিও ক্ষিতীশ মুখার্জী অনুশীলন দলে ছিলেন) তাঁদের সামীরবাগের বাড়ীতে বোমা তৈরী করার সময় হঠাৎ একটা বোমা প্রচণ্ড শব্দে ফেটে গিয়ে ক্ষিতীশবাবুর বাঁ হাতটি দারুণ ভাবে জখম হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে স্টোভ ফেটে হাতের ঐ অবস্থা হয়েছে বলে ভর্তি করে দেওয়া হল।

হাসপাতালে ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রকৃত তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং ক্ষিতীশবাবুকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে অপারেশন করে তার বাঁ হাতের কব্জীটি বাদ দিয়ে দেয়।

ক্ষিতীশবাবু পরবর্তীকালে আর. এস. পি. আই-তে যোগ দেন। ১৯৪২ সালে ঢাকা জেলে তাঁকে দেখেছি বাঁ হাতের কব্জীটি ছাড়াই তাস খেলতে ও চমৎকার হার্মোনিয়াম বাজাতে।

এরপর শুরু হয় গোয়েন্দা পুলিশের অনুসন্ধানপর্ব। কয়েক দিন পরেই পুলিশ জানতে পারে যে সামীরবাগের কোন বাড়ী থেকেই বোমাটি বিস্ফোরিত হয়েছিল। সাদা পোশাকের পুলিশের বাড়ীর আশপাশে আনাগোনা শুরু হলেই পিসেমশাই ননীদাকে নিয়ে চলে আসেন ঢাকেশ্বরী মন্দিরে। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত শম্ভু ঠাকুর তার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি সেখানে আশ্রয় দেন। ইতিমধ্যে পুলিশ বুঝে গিয়েছে কালীপ্রসন্ন ঘোষ ঐ বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত। একদিন বাড়ীর লোকের কাছে পুলিশ জানিয়ে দিয়ে গেল যে তিনি (কালীপ্রসন্ন ঘোষ) যেন এক্ষুনি একবার থানায় গিয়ে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করেন। কয়েকদিন পর ঢাকেশ্বরী মন্দিরের কাছেও সাদা পোশাকের গোয়েন্দাদের আনাগোনা শুরু হল। প্রায় পনের দিন ঢাকেশ্বরী মন্দিরে থাকার পর বাড়ীর অভিভাবকরা স্থির করেন যে কোর্টে গিয়ে ননীদার আত্মসমর্পণ করা উচিত। সে অনুযায়ী একদিন তাঁর বাবা ও মেসোমশাই বরদাকান্ত চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর নিজস্ব ঘোড়ার গাড়ীতে রওয়ানা হলেন কোর্টের দিকে। তৎকালীন বাংলাদেশের পরিস্থিতি তখনও তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেননি। তবু কী মনে হওয়াতে বুদ্ধিমান বরদাকান্ত চৌধুরী গাড়িসহ সরাসরি কোর্টে না গিয়ে নবাবপুর রোডের উপর গাড়ি দাঁড় করালেন। ননীদাকে গাড়িতে রেখে দুইজনে প্রথমে গেলেন পরিচিত উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে। উকিল সমস্ত ঘটনা শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, আসামীকোথায়? গাড়ীতে অপেক্ষা

করছে শুনে বললেন. এক মুহূর্ত দেরী না করে নদীর পারে চলে গিয়ে সেখান থেকে নৌকায় যে কোন গ্রামে গিয়ে সাময়িকভাবে হলেও আশ্রয় নিতে। উকিল আরও বললেন এখন আত্মসমর্পণ করা মানে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া।

কিছুদিন আগে শ্রীসঙ্ঘের অন্যতম নেতা অনিল দাসকে গ্রেপ্তার করে স্বীকারোক্তির জন্য চটের বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে অমানুষিকভাবে অত্যাচার করে। এর ফলে অনিলবাবুর মৃত্যু হয়। অনিল দাস ছিলেন সুনীল দাস ও শহীদ লতিকা সেনের দাদা। সুনীল দাস ১৯৫৭ সালে প্রজা সোসালিষ্ট পার্টির হয়ে পঃ বঃ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। লতিকা সেন ১৯৪৯ সালে বহুবাজারের মোড়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

এরপরই তাঁরা সরাসরি ঢাকার বাদামতলীর ঘাটে এসে নৌকাযোগে হাঁসাড়ার বাড়িতে এসে উপস্থিত হন। সেখান থেকে একসপ্তাহের মধ্যেই দফাদারেব আগমনের পর চলে গেলেন আরেক আত্মীয়ের বাড়ী চিত্রকোট গ্রামে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখেন যে বাড়ীর সঙ্গেই রয়েছে গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের বাড়ী। পরের দিনই রওয়ানা হয়ে কলিকাতায় এসে উঠলেন দিদির ডাঃ জগবন্ধু লেনের বাড়ীতে। কলিকাতায়ও বেশীদিন থাকা নিরাপদ মনে করলেন না। পনের দিনের মধ্যে চলে গেলেন হরিদ্বার ভোলাগিরি আশ্রমে। ননীদার বাবা ছিলেন ভোলাগিরির শিষ্য। সেই আশ্রমে তখন বহু পুরাতন বিপ্লবী সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করছিলেন। মণ্ডলেশ্বর মহাদেবানন্দ গিরি ছিলেন একদা 'যুগান্তর' দলের সদস্য। আশ্রমে কয়েকমাস থাকার পর একদিন উত্তর প্রদেশের পুলিশ আশ্রমে গিয়ে কোন এক বাঙালী স্বদেশীবাবুর খোঁজ করলে পরের দিনই সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে তিনি চলে আসেন গৌহাটিতে। এখানে কিছুদিন পর কোন এক গোপনসূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে ঢাকায় নিয়ে আসে।

ঢাকা জেলে কিছুদিন রেখে নিয়ে আসে দেউলী বন্দী শিবিরে। ১৯৩৬ সালে তাঁকে জেল থেকে ছেড়ে ঢাকার বাড়ীতে অন্তরীণ করা হয়। অন্তরীণ অবস্থায় তিনি বি. এ পাশ করেন।
পরবর্তী কালে তিনি এল আই সি-তে একজন প্রথম শ্রেণীর অফিসার হয়েছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে কোন সম্পর্কই ছিল না। ১৯৭৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

জন্মাষ্টমীর মিছিল

জন্মাষ্টমীর আগের দিন বাড়ীর ঘাট থেকে সকালবেলা লঞ্চে উঠে বেলা ১০টার মধ্যে ঢাকা সদরঘাটে পৌঁছাই। লঞ্চ থেকে নেমেই দৌড়ে এসে পিনিশে উঠি। বড়দা তখন গল্প করছিলেন অনুশীলন দলের অন্যতম নেতা বীরেন গাঙ্গুলীর সঙ্গে। জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখার জন্য পরের দিন দুপুরের দিকে বাড়ীর অন্যান্যদের সঙ্গে চলে আসি নবাবপুর রোডে প্রয়াত ডাঃ সুরেশ মিত্র মশাই-এর চেম্বারের দোতলার বারান্দায়। এরই মধ্যে হাজার হাজার মানুষ রাস্তার দুই ধারে দাঁড়িয়ে পড়েছে মিছিল দেখার জন্য। প্রায় সবারই হাতে ছিল একটা করে গেণ্ডারী (আখ)। মিছিল দেখার একটা প্রধান অঙ্গ ছিল এই গেণ্ডারী আখ খাওয়া। প্রথম দিন নবাবপুরের ও পরের দিন ইসলামপুরের মিছিল বের হবে। ঢাকাতে একটা কথা চালু ছিল যে নবাবপুরের মিছিল "সাতেগোতে" (বারোয়ারী) আর ইসলাম-পুরের মিছিল "বাপেপুতে" (পারিবারিক)। এই জন্মাষ্টমীর মিছিলে মুসলমান সম্প্রদায়ও অংশগ্রহণ করতেন। অনবদ্য ভাষায় এই মিছিলের এক বর্ণনা দিয়েছেন শিল্পী পরিতোষ সেন তাঁর বিখ্যাত 'জিন্দাবাহার' গ্রন্থে।

"শ্রাবণে রৌদ্রচুম্বিত বিকেল বেলা। যে দিকেই তাকাই না কেন রাস্তা ঘাটে, ছাদে, কার্নিশে, বারান্দা, রোয়াকে, গাছে, ল্যাম্পপোস্টে সর্বত্রই কালো কালো বিন্দু। এক কথায় কালো বিন্দুর মহাসমুদ্র।

গোটা ঢাকা শহর এক অস্বাভাবিক উত্তেজনায় মেতে উঠেছে। আজ জন্মাষ্টমীর মিছিল বের হবে। এমন জমকালো এমন বিশালকায় এবং অসাধারণ চমৎকারিত্বপূর্ণ এই ঘটনা এই উপমহাদেশে আর কোথাও কি দেখা যায়?..."দুইপাশে সারি সারি নানা রঙের ঝলমলে নিশান, অতিকায় মলমলের ছত্র, পাখা, চামর, বর্শা আরও কত কী। সঙ্গে আছে ঢাক, ঢোল, নাগড়া, শিঙা এমন কি ব্যাণ্ড পার্টিও.... তারপর আরও সঙ, আরও ঘোড়া, আরও হাতী আর গ্যালারী। এক অন্তহীন সচল, সাড়ম্বর অদৃশ্যপূর্ব প্রদর্শনী।"

উত্তাল ধলেশ্বরীর বুকে

জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখা শেষ। বাড়ী ফিরে যাচ্ছি গয়নার নৌকায়। সন্ধ্যার একটু পর নৌকা ছেড়ে দিল। সদর ঘাটের সারি সারি ইলেকট্রিক পোস্টের সবগুলি আলোই জ্বলে উঠেছে। তিন দাঁড়ি নৌকা অল্প সময়ের মধ্যেই এসে পড়ল সদর ঘাটের বিপরীত দিকে সুবিড্ডার খালে। এখান থেকে আলো ঝল্‌মল্‌ ঢাকা শহরকে রূপকথার স্বপ্নপুরীর মতো মনে হচ্ছিল। নৌকা এগিয়ে চলেছে। ধীরে ধীরে ইলেকট্রিক পোস্টগুলো আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেল। অনুকূল বাতাসে নৌকা তরতর করে এসে পড়ল অল্প সময়ের মধ্যে ধলেশ্বরীর পাড়ে। কৃষ্ণপক্ষ চলছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কেবল শুনতে পাচ্ছি নৌকার গায়ে আছড়ে পড়া ঢেউ-এর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, প্রবল ঝড়ো হাওয়া বইছে নদীতে, অল্প অল্প বৃষ্টির সঙ্গে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আকাশে। বিশাল মাস্তুলে পাল তুলে দিয়ে মুলফত মাঝি আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে আল্লার কাছে দোয়া মেঙে নৌকা ছেড়ে দিল। বর্ষায় ধলেশ্বরীও পদ্মা নদীর মতোই ভয়ঙ্করী হয়ে উঠে। কূল-কিনারাহীন দিগন্ত-বিস্তৃত নদী উত্তাল উদ্দামবেগে বয়ে চলেছে ক্লান্তিহীন ভাবে। প্রবল বাতাসে পাল ফুলে ফেঁপে উঠে, ঢেউ-এর উপর দিয়ে নাগরদোলার

মত দুলতে দুলতে নৌকা ঝড়ের বেগে ছুটে চলল কুইচামারার দিকে। নৌকা তখন মাঝদরিয়ায়। এক বিরাট উঁচু ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল নৌকার গায়ে। ঢেউ-এর ছটায় যাত্রীদের একাংশকে ভিজিয়ে দিয়ে একদিকে কাত হয়ে পড়লে মুলফত মাঝি তার পেশীবহুল দুটি হাতে শক্ত করে হাল ধরে নৌকার গতি ঠিক রাখার জন্য মরণপণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক এই সময় আর একটি ঢেউ এসে প্রচণ্ড বেগে নৌকায় আঘাত করল। 'নাহি মানে হাল, তরী টলমল অশান্ত উত্তাল।' যাত্রীরা প্রাণভয়ে খোদাতাল্লা, ঈশ্বর ও মধুসূদনের কাছে এ যাত্রায় তাদের প্রাণরক্ষার আকুল আবেদন জানাতে লাগল। আমি এক কোণে ভয়ে ছোড়দার হাত ধরে বসে আছি। ছোড়দা বলল, 'কোন ভয় নেই, মুলফত ঠিকমতই ওপারে নৌকা নিয়ে যাবে।' দেখলাম তাঁর কথাই ঠিক। কিছুক্ষণের মধ্যে মুলফত মাঝি তার অনন্যসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে কুইচামারায় আমাদের অতিপরিচিত বটগাছের নীচে নৌকা ভিড়িয়ে দিল।

এর পর বহুবার পদ্মা, ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গার উপর দিয়ে যাতায়াত করেছি, অনেক জল-ঝড়ের মধ্যেও পড়েছি। কিন্তু আমার আট বছর বয়সে উত্তাল ধলেশ্বরীর বুকে সেই রাত্রির কথা আজও মনে গেঁথে আছে।

দেশবন্ধুপত্নী

দুর্গাপূজা এসে গেল। একদিন শুনতে পেলাম এবার পূজায় বাসন্তীদেবী আসবেন হাঁসাড়াতে তাঁর জামাই ও মেয়ের সঙ্গে। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার পর হাঁসাড়া ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষ তাঁকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিল। পঞ্চমীর সকাল, মোটর লঞ্চে একদল লোক রওয়ানা হয়ে গেল ভাগ্যকুল স্টীমার ঘাটে তাঁকে নিয়ে আসার জন্য। বেলা দশটার মধ্যে স্টীমার সেখানে

পৌঁছানোর কথা। আমরা ৪০/৫০ জন লোক একটা বিরাট বাইচের নৌকা করে এগারটা নাগাদ এসে পড়লাম পুঠিমারার খালে গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে বাসন্তী দেবীকে সম্বর্ধনা জানানোর উদ্দেশ্যে। বেলা দুটো বাজতে চলল, আমাদের আকাঙ্খিত মোটর লঞ্চের শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। নৌকা একটু একটু করে এসে পড়ল ঘোলঘর মহাশশ্মানের কাছে। তখন তিনটে বেজে গেছে। হঠাৎ লঞ্চের ভট্ ভট্ আওয়াজ কানে এল। অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের নৌকার কাছে আসতেই আকাশ, বাতাস, খাল-বিল মুখরিত করে শত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল 'বন্দেমাতরম্', 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস কি জয়', 'বাসন্তী দেবী কি জয়'। পরে শুনতে পেলাম পথে হাজার হাজার মানুষ লঞ্চ থামিয়ে বাসন্তী দেবীকে অভিনন্দন জানানোর জন্যই এত দেরী। ক্রমে লঞ্চ এসে বাড়ীর ঘাটে থামলে—ঢাক, ঢোল, শাঁখ বাজিয়ে ও উলুধ্বনি দিয়ে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়।

১৯৩২ সালের শেষের দিকে অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসছে এমন সময় মহাত্মা গান্ধী আমরণ অনশন শুরু করেন হরি-জনদের উপর সামাজিক নির্যাতনের প্রতিবাদে। এই আন্দোলনের অন্যতম কর্মসূচী ছিল অস্পৃশ্যতা বর্জন। আগেই স্থির যে বাসন্তী দেবী বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে হরিজনদের নিয়ে দুর্গামণ্ডপে মণ্ডপে পুষ্পাঞ্জলি দেবেন।

সপ্তমী থেকে দশমীর দিন সকাল পর্যন্ত আমরা লঞ্চে করে বেরিয়ে পড়তাম ঘোলঘর, শেখেরনগর, বেলতলী প্রভৃতি গ্রামের পূজামণ্ডপ-গুলিতে। হরিজন সহ শত শত মানুষ একত্রে উৎসাহের সঙ্গে বাসন্তী দেবীর নেতৃত্বে অঞ্জলি দিত। সে সময় বর্ণহিন্দুরা হরিজন-দের সঙ্গে অঞ্জলি দেওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারত না। লক্ষ্মী-পূজার পরের দিন বাসন্তী দেবী রওয়ানা হয়ে গেলেন ঢাকার পথে। এক অভিজাত পরিবারের বধূ হয়েও সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর

আন্তরিকতাপূর্ণ ও অমায়িক ব্যবহারে সবাই অভিভূত হয়ে পড়েছিল। সেই অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনা ও আনন্দময় দিনগুলির কথা বহু যুগ পর আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

১৯৩৩ সালের ২৫শে জানুয়ারীর সন্ধ্যার পর তারিণী দফাদাব বাড়ীতে এসে জানিয়ে গেল, 'গোপাল বাবু যেন একটু সইরা সইরা থাকেন। ছিন্নগর থানা থাইক্যা বড়দারগাবাবু অনেক পুলিশ লইয়া ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসের সামনে ঘাঁটি গারছে। কাইল (আগামী-কাল) সকালে (২৬শে জানুয়ারী) নিশান তুললেই চালান দিব'।

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩৩

২৬শে জানুয়ারী সকালেই খবর আসল যে হাঁসাড়া বাজারে কাঠের পুলের সামনে পুলিশ ঘেরাও করে আছে। কারণ ঐ জায়গায়ই স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলন করা হয়। অনেক বেলা পর্যন্ত পুলিশ সেখানে অপেক্ষা করে কাউকে না পেয়ে চলে আসে। ঐ দিনই বিকালের দিকে আমরা ২৫/৩০ জন বালক ও কিশোর একত্র হয়ে চৈত্র সংক্রান্তির মেলার মাঠের মাঝখানে একটা বাঁশ পুতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে 'বন্দেমাতরম্', 'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক' প্রভৃতি স্লোগান দিতে শুরু করা হয়। স্লোগান শুনে কাছেই ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস থেকে একজন পুলিশসহ দুইজন চৌকিদার আসতেই প্রায় সব ছেলেই পালিয়ে গেল, দাঁড়িয়ে থাকল কেবল বোঁচা, মধু (জীবন কানাই সরকার) ও নির্মল। আমাদের মধ্যে বয়সে একটু বড় বোঁচাকে টানতে টানতে নিয়ে দারোগার কাছে উপস্থিত করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারলাম বোঁচাকে শ্রীনগর থানায় চালান দিয়েছে। এ খবরে ওর মা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। প্রায় দুই তিন ঘণ্টা পর একটু রাতের দিকে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে বোঁচা বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়। ওর কাছ

থেকে জানতে পারলাম যে গ্রাম থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে কেওয়াট-খালির মাঠে শ্রীনগর থানার দারোগা তাকে খুব আচ্ছা করে কয়েকটি লাঠির ঘা দিয়ে, ঘাড় ধাক্কা মেরে ছেড়ে দেয়। এরপর থেকেই বোঁচা বালক ও কিশোরদের নেতা বনে গেল।

তার নাম হলো বোঁচাই সরদার।

কালীপদ মুখার্জীর ফটো

ইতিমধ্যে হাঁসাড়ার স্কুলে ভর্তি হয়েছে। একদিন স্কুলে ঢুকতেই দেখি কমন রুমে ছাত্রদের খুব ভীড়, সবাই দেওয়ালে আঠা দিয়ে লাগানো একটি যুবকের ফটো দেখছে। ফটোটির গায়ে হাতে লেখা ছিল ; শহীদ কালীপদ মুখার্জী। কামাখ্যা সেনকে হত্যার অভিযোগে কয়েকদিন আগে ঢাকা জেলে তার ফাঁসি হয়ে গেছে।

(কামাখ্যা সেনের হত্যার প্রধান নায়ক অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট কর্মী ও আর. এস. পি আই-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত দুর্গেশ ভট্টাচার্য ১৯৮১ সালে 'অনুশীলন বার্তা'য় এই হত্যাকাণ্ডের বিস্তৃত বিবরণ লিখে গেছেন।)

কালীপদ মুখার্জী ছিলেন বিক্রমপুরের একজন সাধারণ কংগ্রেস কর্মী এবং কিছুটা পাগলাটে ধরনের ব্যক্তি। হত্যাকাণ্ডের দুই তিন দিন পর খেয়ালের বশে কোন বন্ধুকে "কামাখ্যা অপারেশান সাক-সেস্‌ফুল" এই মর্মে টেলিগ্রাম করতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। এরপর পুলিশ তাঁকেই হত্যাকারী প্রমাণ করে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দেয়।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যু

১৯৩৩ সালে পুরোদমে বর্ষা নেমেছে। ক্লাস টীচার গাজি সাহেব (মফিজউদ্দিন গাজি) সবে রোল কল শেষ করেছেন। এমন সময়

স্কুলের দপ্তরী একটা নোটিশ নিয়ে আসল। গাজি সাহেব ওই নোটিশটি পড়ে ছাত্রদের বললেন যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য স্কুল প্রথম পিরিয়ডের পর ছুটি হয়ে যাবে। ছুটির নাম শুনে ছেলেরা হৈ হৈ করে উঠল। তিনি এক ধমক দিয়ে সবাইকে চুপ করে বসতে বললেন। এরপর অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলে চললেন যতীন্দ্র মোহন সম্বন্ধে. সবটা আজ মনে নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে গাজী সাহেব বলেছিলেন যে একজন মহৎ প্রাণ মানুষ আমাদের ছেড়ে অকালে চলে গেলেন।

ছোড়দা গ্রেপ্তার

১৯৩৪ সালের এক সকাল বেলা বাইরের ঘরে পড়তে বসেছি। কয়েকদিন যাবত শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারা বয়ে চলেছে। হঠাৎ জানালার দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম একটি দারোগার নৌকা বাড়ীর ঘাটে ভিড়ল। বৃষ্টির মধ্যেই দারোগাবাবু একদল কনেষ্টবল সহ ঘরে ঢুকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন বিনয় রায়চৌধুরী বাড়ী আছেন কিনা। উত্তরে বললাম, মাষ্টামশাইএর বাড়ী পড়তে গেছেন। দারোগাবাবু এসে চেয়ারে বসলেন। কিছুক্ষণপর দারোগা—কয়েক জন পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আর একজনকে ঘরে বসিয়ে রেখে নৌকা ছেড়ে দিলেন মাস্টারমশাই সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীর পথে। ইতিমধ্যে লোক দিয়ে ছোড়দাকে খবর পাঠান হয়ে গেছে।

দারোগা চলে যেতে মা আমাকে সমস্ত বইখাতা নিয়ে অন্য ঘরে চলে যেতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বই ও খাতাগুলি নিয়ে অন্য ঘরে চলে গেলাম। অপেক্ষারত পুলিশটি কিন্তু আমাকে বাধা দেয়নি। এই বইগুলির মধ্যে ছিল দুটি নিষিদ্ধ বই; 'ফাঁসীর সত্যেন' ও 'পথের দাবী'। কিছু সময়ের মধ্যে ছোড়দাকে সঙ্গে নিয়ে দারগা বাড়ী এসে খানাতল্লাসী শুরু করে দিল। প্রায় দুই ঘণ্টা তন্ন তন্ন করে তল্লাসী

করার পর আপত্তিকর কিছু পাওয়া গেলনা।

বেলা-দ্বিপ্রহর, দারোগা সাহেব ছোড়দাকে নিয়ে শ্রীনগর থানায় রওয়ানা হবেন। মা ছোড়দা ও আমাকে খেতে দিলে ঠাকুমা দারোগা-কেও কিছু খেয়ে নিতে বললেন। দারোগা ঠাকুমাকে প্রণাম করে বললেন, বহুবাড়ীতে খানাতল্লাসী করে বহু ছাত্র ও যুবককে গ্রেপ্তার করেছি। কোনওদিন এমনি অনুরোধ কেউ করেনি। আপনি এক-মাত্র ব্যতিক্রম।

দারোগা ঐদিনই ছোড়দাকে নিয়ে ঢাকায় রওয়ানা হলেন। তিন দিন ঢাকা আই, বি অফিসে বিরামহীন জেরার পর যে কোন কারণেই হউক ছোড়দাকে ছেড়ে দিল। কিন্তু সেই সঙ্গে এই মর্মে এক সর-কারী আদেশ জারি করা হল যে সন্ধ্যার পর বাড়ী থেকে বের হতে পারবে না এবং গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হলে আগে থানায় জানাতে হবে।

ছোড়দা প্রকাশ্য আন্দোলনে যোগ না দিলেও অনুশীলন সমিতির সঙ্গে গুপ্তভাবে যুক্ত ছিলেন। ঢাকা পগোজ স্কুলে ছাত্রাবস্থায় অনুশীলনের বিশিষ্ট কর্মী তারাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও ভূপেশ ব্যানার্জীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন।

গোরা সৈন্যের ক্যাম্প

১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে স্কুল থেকে ফেরার সময় দেখলাম একটু দূরে কুমার পাড়ার মাঠে সারি সারি তাঁবু খাটানো হচ্ছে। সেইসঙ্গে টেলিফোন লাইনের জন্য পোঁতা হচ্ছে বাঁশের খুঁটি, কয়েক-জন গোরা সৈন্য এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেই সময় পূর্ববাংলার গ্রামে গ্রামে এ ধরনের বহু ক্যাম্প হয়ে-ছিল বিপ্লবী ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে অসংখ্য ছাত্র ও যুবককে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত আছে সন্দেহে।

সেনাবাহিনী প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় অথবা গভীর রাত্রিতে হানা দিত গৃহবন্দী ছাত্র ও যুবকদের বাড়ীতে বাড়ীতে—সন্ধ্যার পর তারা ঘরে আছে কিনা তা প্রত্যক্ষ করতে। আমরা সন্ধ্যার পর পড়তে বসেছি, এমন সময় শুনতে পেলাম সৈন্যবাহিনীর বুটের মচ্‌মচ্‌ শব্দ। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দফাদার থাকত।

ছোড়দাকে দেখে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করে চলে যেত। রাত্রে হয়ত খেতে বসেছি এমন সময় কুইক্ মার্চ করে বাহিনী এসে উপস্থিত হত একেবারে খাবার ঘরের সামনে। ক্যাপ্টেন সাত ব্যাটারীর টর্চ মুখে ফেলে পরখ করে নিত এই প্রকৃত গৃহবন্দী কিনা। গভীর রাত্রি সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন। প্রচণ্ড জোরে রাইফেলের কুঁদোর আঘাতে দরজা ভেঙে যাবার উপক্রম। দরজা খুলতেই মুখের উপর টর্চ এবং দেরিতে দরজা খোলার জন্য কিছু ধমক দিয়ে চলে যেত। এইভাবে সেনাবাহিনীর উৎপাতে আমাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

এই সময় চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে যে সঙ বের হতো তাতে একটা গান খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। "গোরা সৈন্য ক্যাম্প বহাইল—কুমার পাড়াতে/মন্ডি রাত্রে হানা দেয় বাড়ি বাড়িতে"।

২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস উৎযাপন

১৯৩৯ সালের ২৬শে জানুয়ারী মুক্ত রাজবন্দী শান্তি সোমের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস পালন করা। হাঁসাড়া বাজারের নূতন তৈরী উঁচু কাঠের পুলের রেলিং--এর সঙ্গে বাঁধা লম্বা এক মুলিবাঁশের ডগায় বৃদ্ধ কালীকুমার পণ্ডিত 'বন্দে-মাতরম্' 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর শান্তিদা প্রায় পঞ্চাশজন ছাত্র--যুবককে স্বাধীনতার সংকল্প পাঠ করান।

"আমরা বিশ্বাস করি যে, অন্য যে কোন জাতির ন্যায় বিকাশের পূর্ণ সুযোগ লাভ করিবার জন্য স্বাধীন হওয়ার, পরিশ্রমের ফল ভোগ করিবার এবং জীবনে যাহা কিছু প্রযোজন সে সকল অর্জনের অবিচ্ছেদ্য অধিকার ভারতবাসীর আছে।"

"ভারতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কেবল যে ভারতবাসীদিগকে তাহাদের স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে তাহাই নয়, জনগণের শোষণের উপর ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক দিক হইতে ভারতকে ধ্বংস করিয়াছে। অতএব আমাদের বিশ্বাস, ভারতকে অবশ্যই বৃটিশের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে।"...

শান্তিদা প্রায় সাত বৎসর রাজবন্দী হিসাবে আটক থাকার পর ১৯৩৮ সালে মুক্তি পান। প্রথম জীবনে ছিলেন 'যুগান্তর' দলের (জীবনলাল চ্যাটার্জীব গ্রুপ) সদস্য। দেউলি ডিটেন্শন ক্যাম্পে কমিউনিস্ট সংহতিতে যোগ দেন। জেল থেকে বের হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসাবে গণআন্দোলন সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ কবেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে কোন দলীয় সংকীর্ণতা ছিল না। প্রয়োজনে যে কোন রাজনৈতিক দলেব কর্মীকে তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় দিতেন। অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, উদার ও আড্ডাবাজ মানুষ শান্তিদা। দেশ ভাগের পর ঢাকার বাড়ী বিনিময় কবে সপরিবারে পার্ক সার্কাসের এক ছোট্ট বাড়ীতে বসবাস কবতে থাকেন। কোন বাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।

আড্ডা মারার ফ্যাসাদ

দেশ ভাগের পব বহু বছব কেটে গেছে। শান্তিদা অসুস্থ শুনে পার্ক সার্কাসের বাড়ীতে তাঁকে দেখতে যাই। আমাকে দেখে তিনি খুবই খুশী হলেন। একটু পরেই বললেন, এতক্ষণ শুয়ে ছিলাম, চোখের সামনে ভেসে উঠছিল ছেড়ে আসা গ্রামের ছবি। এখন ভরা বর্ষা, হাঁসাড়া গ্রামে এখন কত জল, বাড়ীগুলি জলের মধ্যে যেন দ্বীপের মত ভাসছে। বাজারের ঘাটে কত নৌকা। হাঁসাড়া যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকৃছে।

বেশ খানিকটা সময় কেটে যাওয়ার পর বললাম, অনেকক্ষণ আড্ডা মারা হল, এবার যাই। উত্তরে তিনি বললেন, আড্ডা মারার

কথাই যখন উঠল একটু বসে শুনে যা ঐ আড্ডা দিতে গিয়ে কি রকম ফ্যাসাদে পড়েছিলাম। ১৯৫৫ সালে শান্তিদা গ্রামের বাড়ীতে যান দুই নাবালক ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। এক সপ্তাহ হাঁসাড়া থাকার পর ঢাকা চলে আসেন, বন্ধু কালীপদ সেনের বাড়ীতে। পূর্ব পাকিস্থানে সে সময় যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। আওয়ামী লীগের সদস্য আতাউর রহমান প্রধানমন্ত্রী। কিছুটা গণতান্ত্রিক হাওয়া বইছে সেখানে। কলিকাতা রওয়ানা হবার ঠিক আগের দিন তিনি যান তাঁর পুরানো দিনের বন্ধু জ্ঞান চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করতে (প্রয়াত জ্ঞান চক্রবর্তী তখন ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক)। শান্তিদা বলে যাচ্ছেন—আইজ রবিবার, কাইল সোমবার কলিকাতা রওয়ানা হমু। সন্ধ্যার দিকে গেলাম জ্ঞানবাবুর সদর ঘাটের মেসে একটু আড্ডা দেওনের লাইগ্যা। কবে যে আর দেখা অইব ঠিক নাই আমাকে দেইখ্যা তিনি খুব খুশী অইলেন। গল্পে গল্পে রাত দশটা বাইজ্যা গেলে উইঠ্যা পড়লাম। এমুন সময় জ্ঞানবাবু কইল, আপনে ত কাইল বেলা বারটার সময় কইলকাতা রওয়ানা অইবেন। আবার কবে দেখা অইব কে জানে। পাশের চকিটা খালি আছে। আসেন দুইজনে হোটেলে খাইয়া আরও কিছুক্ষণ গল্প কইরা শুইয়া পরুম। সকালে উইঠ্যা চইলা যাইবেন। আমি তার কথা শুইনা খুব খুশী। হোটেল থাইকা আইসা প্রায় রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত অনেক গল্প করলাম। শ্যাষ রাত্রে দরজায় ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ। জ্ঞানবাবু দরজা খুলতেই একদল পুলিশ ঘরে ডুইকা পড়ল। তার লগে আমারেও ধইরা লইয়া গেল কতোয়ালী থানায়।

সেখানে গিয়ে জানতে পারেন যে গভীর রাত্রে করাচীর নির্দেশে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বাতিল করে অনেক মন্ত্রীকেই গৃহবন্দী ক'রে রাখা হয়েছে। এই সঙ্গেই শুরু করা হয়েছে ফ্রন্টের সমর্থক বিভিন্ন দলের নেতা ও কর্মীদের নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার।

—এরপর আমিও জ্ঞানবাবুর লগে থানায় বইসা রইলাম। কিছুক্ষণ

পর ও সি আইসা আমারে কইল, এ্যারেস্ট লিষ্টে আপনার নাম নাই দেখতে আছি। আমি তখন ও-সি'কে কইলাম, আমি ভারতীয় নাগরিক। আমার পাশপোর্ট ও ভিশা দেখার পর কইল, ঠিক আছে। আপনারে ছাইরা দিমু। আই বি অফিসে টেলিফোন কইরা এ খবরটা দিয়া লই। প্রায় পনর মিনিট পর আইসা খবর দিল যে আপনারে ছাড়ন যাইব না। টেলিফোনে নাম শুইনাই অফিসার কইল, পুরানো পাপী, এখনকার মত আটকান, পরে দেখা যাইব। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে আমাগো ঢাকা জেলে লইয়া গেল। গিয়া দেখি অনেকেই আইসা পরছে। জিতেন ঘোষ, মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লা কাইজার, মুজফ্‌ফর আহমেদ, আরও অনেকে। আমাগো রাখল সেই পুরানো জায়গায় ৫নং খাতায়। ১৯৩২ সালে অনেকদিন এখানে থাইকা গেছি।

প্রায় ছয় মাস পর ছাড়া পাইয়া কইলকাতা আসি। আইসা দেখি দশ হাজার টাকা রিফুজি লোন লইয়া বৌবাজারে যে কাঠের ফার্ণিচারের দোকানটা খুলছিলাম সেইটা তালাবন্ধ। আমার ঢাকা জেলের আটকের খবর পাইয়া কর্মচারী সব বেইচা দিয়া কোথায় চইলা গেছে। তারপর অনেকদিন পর্য্যন্ত খুবই কষ্টে দিন গেছে পোলা মাইয়ার চাকরী না হওয়া পর্য্যন্ত। তবে যাই হউক না ক্যান, ঐ ছয় মাস এতগুলি জ্ঞানী গুণী লোকের মধ্যে খুবই আনন্দে কাইটা গেছে। মনে হয় ৫ বছর দেউলিতে যা শিখছিলাম তার থিকা অনেক বেশী শিখছি ছয় মাসে। ১৯৮০ সালে ৭৪ বছর বয়সে শান্তিদার মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছাত্র আন্দোলনের হাতেখড়ি

ঢাকা—আমার ঢাকা

১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে ঢাকা কে. এল. জুবিলী স্কুলে ভর্তি হই। প্রায় দুই মাইল পথ হেঁটে স্কুলে যাতায়াত করতে হত।

আমার আবাল্য পরিচিত ঢাকা নগরী। গ্রামে থাকলেও শহরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল গভীর। প্রতি বছর বিভিন্ন উপলক্ষে এখানে আসতে হত।

ইংরেজের তৈরী কলকাতার তুলনায় ঢাকা অনেক প্রাচীন শহর। মোঘল আমলে এর জন্ম। মুসলিম সংস্কৃতির একটা রেশ এখানে বিরাজমান। ঢাকার কুট্টিদের একটি ছোট অংশের মধ্যে উর্দু-মিশ্রিত হিন্দীভাষার প্রচলন ছিল। অবিভক্ত বাংলাদেশে কলিকাতার পরই ছিল ঢাকার স্থান। যদিও কলিকাতার বিরাটত্বের সঙ্গে তার তুলনা চলে না, তবু শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্পবাণিজ্য ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ঢাকা ছিল সেই যুগের বাংলাদেশের দ্বিতীয় কেন্দ্র।

ঢাকার ভুবনবিখ্যাত মসলীন্, শঙ্খশিল্প, ভারতবিখ্যাত জন্মাষ্টমীর মিছিল, বাখরখানি, অমৃতি, ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানদের উপস্থিত বুদ্ধি ও অসাধারণ রসবোধ, কুট্টিদের এক বিশেষ বাচনভঙ্গি, বুড়িগঙ্গার তীরে মনোরম ব্যাকল্যাণ্ড বাঁধ, ঘাটে বাঁধা রং-বেরং-এর পিনিসের (বজরা) বহর, চোখ জুড়ানো সবুজবরণ রমনার ময়দান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীব সুন্দর ক্যাম্পাস—এই নিয়েই ঢাকা।

আর একদিকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান ছিল এই শহর। অসংখ্য বিপ্লবীর জন্ম দিয়েছে এই ঢাকা। বারবার ইংরেজ রাজপুরুষদের উদ্দেশ্যে বিপ্লবীদের পিস্তল গর্জে উঠেছে এখানে।

বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত, ধনেশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি প্রখ্যাত বিপ্লবীদেব স্মৃতিবিজড়িত এই শহর। এছাড়াও ছিলেন অসংখ্য বিপ্লবী যাঁরা চিরদিন রয়ে গেলেন অপরিচয়ের অন্ধকারে। ইংরেজদের কাছে ঢাকা ছিল এক মূর্তিমান বিভীষিকা।

অপরদিকে এই শহর ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য কুখ্যাত। ইংরেজদের কূটকৌশলে বাধানো এই দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদাযের নিরীহ মানুষের রক্তে বারবার রঞ্জিত হয়ে উঠেছে ঢাকার রাজপথ।

১৯৭১ সালে প্রযাত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ডাকে বাংলাদেশের অবিস্মরণীয় মুক্তিযুদ্ধের শুরু এই শহরেই। এই সমস্ত কিছু নিয়েই ঢাকা আমার স্মৃতিতে ভাস্বর। ঢাকা আজও আমায় ডাকে।

বন্দীমুক্তির দাবীতে ছাত্র ধর্মঘট ও মিছিল

আজও স্পষ্ট মনে আছে স্কুলে টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই ক্লাশ টেন-এব দু'জন ছাত্র এসে আমাদের একটু অপেক্ষা করতে বলেন। প্রথমে সবাইকে ছাত্র ফেডারেশনের সভ্য হবার জন্য আবেদন জানালেন। এরপর ঘোষণা করলেন যে, আগামীকাল (৩১শে আগষ্ট ১৯৩৯) বন্দীমুক্তি কমিটির ডাকে সাড়া দিয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন সিদ্ধান্ত করেছেন যে, রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে বাংলাদেশের স্কুল-কলেজের ছাত্ররা একদিনের ধর্মঘট পালন করবে। তখনও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলে প্রায় ৯০ জনের মত রাজবন্দী আটক ছিলেন। আগামীকাল ধর্মঘটে যারা ভলান্টিয়ার হতে ইচ্ছুক তাদের বিকেলের দিকে জেলা ছাত্র ফেডারেশনের অফিসে যেতে বলে উক্ত দুজন চলে গেলেন।

বাড়ীর কাছেই ফুলবাড়িয়া রোডে ছিল ছাত্র ফেডারেশনের অফিস। সন্ধ্যার দিকে সেখানে গেলে আমাকে পরের দিন দশটার মধ্যে কলেজিয়েট স্কুলের গেটের সামনে উপস্থিত হতে বলা হল। ঢাকা

জেলার ছাত্র ফেডারেশনের তখন সভাপতি ছিলেন রবি বসু এবং সম্পাদক কালীপদ গাঙ্গুলী।

পরের দিন ঠিক সময়ে ঐ স্কুলের সামনে গিয়ে দেখি ইতিমধ্যে প্রায় কুড়িজন ছাত্র ফেষ্টুন ও পতাকা নিয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে স্কুলে ঢোকার পথ অবরোধ করে দিয়েছে। একটু পরেই কিছু ছাত্র স্কুলে ঢোকার চেষ্টা করতেই 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ', 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই' ধ্বনিতে জায়গাটি মুখরিত হয়ে উঠল। এভাবে প্রায় বেলা এগারটা পর্যন্ত এই অবস্থা চললে বেশীর ভাগ ছাত্রই ফিরে গেল। কলেজিয়েট স্কুলে সফল ধর্মঘটের পর চলে আসলাম সদ্য পরিচিত একজন ছাত্র সুকেশ চক্রবর্তীর সাইকেলের পেছনে চড়ে জগন্নাথ কলেজের সামনে। এরপর ওর সঙ্গে বহু স্কুলে ঘুরে এসে আমরা এবং ঐ জায়গার সমস্ত স্কুল-কলেজের ছাত্ররা এসে সমবেত হলাম ভিক্টোরিয়া পার্কের সামনে। কিছু সময় অপেক্ষার পর দেখলাম যে, ঢাকা ইউনিভারসিটির দিক থেকে ছাত্র-ছাত্রীর এক বিশাল মিছিল এগিয়ে আসছে। প্রথম সারিতে ছাত্রীরা, হাতে তাদের রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে অসংখ্য পোষ্টার। পেছনের সারিতে ছাত্রদের হাতে বিশাল কয়েকটি ফেষ্টুন। পার্কের সামনে আসতেই অপেক্ষারত ছাত্ররাও ঐ মিছিলে সামিল হল। হাজার কণ্ঠে দাবি উঠল ঃ রাজবন্দীদের মুক্তি চাই। রাস্তার গাড়ী ও পথযাত্রীরা কিছু সময়ের জন্য থেমে যেতে বাধ্য হল। স্লোগানে স্লোগানে শহরটাকে কাঁপিয়ে মিছিল এগিয়ে চলল সদরঘাটে করোনেশন পার্কের দিকে।

সেদিনের মিটিং-এর সভানেত্রী ছিলেন লীলা রায়। নামটা শোনা ছিল। কাছ থেকে এই প্রথম দেখলাম। বেশ মনে আছে প্রথম বক্তা ছিলেন একজন ছাত্রী। এরপর একজন ছাত্রনেতা বক্তৃতা দেওয়া আরম্ভ করতেই শুরু হল প্রচণ্ড বৃষ্টি, সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। এর মধ্যেই সভার কাজ চলতে লাগল। বৃষ্টির বেগ ক্রমশই বাড়তে শুরু করলে সভানেত্রী তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রত্যেকেই ভিজে চুপ্‌সে পার্ক থেকে বেরোবার সময় দেখতে পেলাম অশান্ত বুড়িগঙ্গার ঢেউগুলি আছড়ে পড়ছে ব্যাক্‌ল্যাণ্ড বাঁধের গায়ে।

কী করে দলে আসলাম

রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে ছাত্র ধর্মঘটের পর কয়েকদিন কেটে গেছে। একদিন বিকেলের দিকে নবাবপুর লেভেল ক্রসিং-এর সামনে ধর্মঘটের দিন পরিচিত সুকেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করল, অন্য কোথাও যাবার না থাকলে ওর সঙ্গে বেড়াতে যাব কিনা। আমি রাজি হয়ে ওর সাইকেলের পেছনে বসার পর নিয়ে এল ওয়ারীর একটি ছোট লাইব্রেরীতে। সেখানে দেখতে পেলাম আট-দশজন ছাত্রযুবক বসে আছেন। সুকেশ আমাকে কুলদা রায় ও নির্মল সেন নামে তুজন যুবকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। কুলদা রায় আমাকে পরের দিন এসে লাইব্রেরীর মেম্বার হতে বললেন। তু-তিনদিন পরে সেখানে গিয়ে দেখলাম, লাইব্রেরীতে নির্মল সেন ও আরও কয়েকজন বসে আছেন। তুআনা চাঁদা দিয়ে মেম্বার হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ বাদেই নির্মল সেনের সঙ্গে বেরিয়ে কাছেই একটি পাঁচিল-ঘেরা মাঠে এসে বসলাম। সেই সময় মাঠের একধারে ভলিবল খেলা চলছিল। ইতিমধ্যে এই মাঠে উপস্থিত কয়েকটি ছেলে এসে নির্মল সেনের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা শুরু করল। কথা শেষ করে ওরা চলে যাবার পর আমাকে ছোট্ট একটি বই দিয়ে বললেন, পড়ে আমার সঙ্গে তু-তিনদিন পর আলোচনা করবে।

বাড়ীতে এনে বইটি খুলে দেখলাম, বইটির নাম "পাঞ্জাব কাহিনী"। ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বিস্তৃত বিবরণ। লেখকের নাম মনে নেই। তবে খুবই শক্তিশালী ও প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা বইটি পড়ে মনে মনে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। মনে পড়ল, কয়েক বছর আগে 'জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস' উপলক্ষে আমাদের গ্রামে মুন্সীবাড়ির মাঠে মিটিং-এর কথা। এর তুদিন পরে

আবার যাই ওয়ারীর লাইব্রেরীতে। এর পরে নির্মলদা "বিপ্লবী বীর নলিনী বাক্‌চী" নামে আর-একটি ছোট্ট বই দিলেন। বইটি ছিল নলিনী বাক্‌চীর সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী। নলিনী বাক্‌চী ১৯১৮ সালে ঢাকা কলতাবাজারে ইংরেজ পুলিশ-বাহিনীব সঙ্গে গুলি বিনিময়ের পর আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পূর্বে পুলিশ তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে তিনি উত্তরে বলেন, "Don't disturb me Let me die peacefully." একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বেচ্ছায় অপরিচয়ের অন্ধকারে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

কয়েক বছর পর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ধাত্রী দেবতা" উপন্যাসটি পড়ে মনে হয়েছিল, পূর্ণর চরিত্রটি তিনি সৃষ্টি করেছিলেন শহীদ নলিনী বাক্‌চীকে লক্ষ্য করেই। ক্রমেই বুঝতে পারলাম ওয়ারীর ঐ লাইব্রেরীর মাধ্যমে আমি কোন রাজনৈতিক দলের সংস্পর্শে এসে পড়েছি। দলের নাম তখনও জানি না, রিক্রুটিং স্তরেই আছি।

ইতিমধ্যে একদিন নির্মলদা সহ কয়েকজন ছাত্রযুবক আবার সেই পাঁচিল-ঘেরা মাঠে বসলাম। ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সেদিন অনেক আলোচনার মধ্যে নির্মলদা বলছিলেন যে, এই যুদ্ধের সুযোগে আমাদের ইংরেজের বিরুদ্ধে এক মস্ত আঘাত হেনে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে হবে। আমাদের 'অনুশীলন সমিতি'র সদস্যদের এজন্য সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। এর পরই আমি দলে পুরোপুরি রিক্রুট হয়ে গেলাম। 'অনুশীলনে'র সঙ্গে আমার সম্পর্ক অবশ্য এই পর্যন্তই। এর কয়েক মাস পরেই উক্ত সমিতি আর. এস. পি. আই-তে রূপান্তরিত হয়।

অনেকদিন আগে থেকেই ঠিক ছিল যে, স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষার পর আর ঢাকা থাকা হবে না। বড়দিনের ছুটির পর স্কুল খুললে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে লালমণির হাট চলে আসি। ঢাকা থেকে

চলে আসার আগে নির্মলদা ও ওয়ারীর লাইব্রেরীর সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে আসা সম্ভব হয়নি।

লালমণিরহাট

এতদিন ছিলাম রাজনৈতিক কর্মচাঞ্চল্যে ভরপুর ঢাকার মত একটি জায়গায়। সেখানে পাড়ায় পাড়ায় বিপ্লবী দলের অস্তিত্বের দরুণ ছাত্র-যুবকরা অনেকেই নিজেদের অজান্তেও কোন না কোন বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে এসে পড়ত।

লালমণির হাট হল শান্ত নিস্তরঙ্গ চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছোট্ট রেলওয়ে শহর। রেলের কর্মচারীদের কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এ জায়গার অর্থনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন।

একজন স্কুলের ছাত্রের পক্ষে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ার কোন পরিমণ্ডলই সেখানে ছিল না। তবু এই যুদ্ধের সুযোগে আমাদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে শেষ আঘাত হানতে হবে—এই একটি চিন্তাই আমার মনে দিবারাত্রি আবর্তিত হচ্ছিল। এখন ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি যে, বন্ধু সুকেশ একদিন হঠাৎ হয়ত খেয়ালের বশেই নিয়ে গেল ওয়ারীর লাইব্রেরীতে। পরিচয় হল ঐ জায়গার কর্মকর্তাদের সঙ্গে। ফলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই উৎক্ষিপ্ত হলাম এক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ কক্ষপথে। কৈশোরের অপরিণত অবস্থাতেই বিচরণ শুরু হল ঐ পথে। অন্য কিছুই আর আমাকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হল না।

এজন্য হয়ত দায়ী সেই যুগ এবং পারিবারিক পরিবেশ। এখানে এসে জানতে পারলাম যে, বড়দা রংপুর জেলারই গাইবান্ধা শহরে একটি ব্যাঙ্কের চাকুরী নিয়ে গত একমাস যাবৎ আছেন। একদিন মাকে নিয়ে রওয়ানা হলাম গাইবান্ধার উদ্দেশ্যে। তিস্তা, কাউনিয়া জংশন ছেড়ে ট্রেন এসে থামল 'চৌধুরাণী' নামে একটি স্টেশনে। জনশ্রুতি যে, এই স্টেশনের কাছে এক গভীর জঙ্গলে ছিল ভবানী পাঠকের মন্দির। তারই মন্ত্রশিষ্যা দেবী চৌধুরাণীর নাম অনুযায়ী এ

স্টেশনের নামকরণ করা হয়েছে। এই জনশ্রুতির ঐতিহাসিক সত্যতা বিচারসাপেক্ষ।

সন্ধ্যার আগেই গাইবান্দা পৌঁছে অফিসের সঙ্গেই একটি ঘরে উঠলাম। রাত্রের দিকে গেলাম ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার হরিশ চৌধুরীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। এটি ছিল একটা রাজনৈতিক পরিবার। হরিশ চৌধুরী ও তাঁর দাদা ছিলেন 'যুগান্তর' দলের স্থানীয় নেতা। দুজনেই ত্রিশ-এর দশকে প্রায় পাঁচ বছরের উপর রাজবন্দী হিসাবে বহরমপুর ও দেউলী ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক ছিলেন। ছোট ভাই ব্যাঙবাবু নলডাঙ্গা ডাকাতির মামলায় সাত বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামান প্রেরিত হয়ে এক বছর আগে মুক্তি পান। হরিশ চৌধুরী ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় খান-সেনাদের দ্বারা নলডাঙ্গা গ্রামে নিহত হন। প্রয়াত চৌধুরী ছিলেন ন্যাশানাল আওয়ামী পার্টির একজন নেতা।

এর পরদিন বড়দা আমাকে নিয়ে গেলেন আবু হোসেন সরকারের বাড়ীতে। তিনি তখন কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচিত এম. এল. এ। ১৯৩২ সালে একজন কংগ্রেস কর্মী হিসাবে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে দমদম জেলে ছিলেন। বড়দার সঙ্গে সেখানেই পরিচয় হয়। প্রয়াত আবু হোসেন সরকার পঞ্চাশের দশকে কিছুদিনের জন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।

আগামীকাল ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস। লালমণির হাটে ছাত্রযুবকদের মধ্যে উক্ত দিবস পালনের জন্য কোন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। অবশেষে ২৫শে জানুয়ারী সন্ধ্যাবেলা দুজন লোক একটি পুরানো দিনের গ্রামোফোনের চোঙ্ মুখে দিয়ে ঘোষণা করে গেল যে, ২৬শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় কিষাণ সভার উদ্যোগে গোশালা বাজারে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। পাঁচটার কিছু আগেই গোশালা বাজার মাঠে এসে পড়লাম। তখনও সভার কাজ শুরু হয়নি। কোন স্থানীয় ছাত্র বা যুবক চোখে পড়ল না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখতে পেলাম যে, প্রায় এক হাজারের মত কৃষকের মিছিল 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। সেদিনের সভাতে প্রধান বক্তা ছিলেন ডাঃ শীতাংশু সেনগুপ্ত।

ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে (১৯৪০) লালমণিরহাট স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম। প্রথমে ক্লাশের মধ্যে অজিত ঘোষ ও শ্যাম চক্রবর্তী নামে দুটি ছেলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সেই সময় লালমণির-হাট স্কুলের নিয়ম ছিল শুক্রবার (জুম্মাবার) নামাজের জন্য বেলা বারোটার সময় স্কুল ছুটি হয়ে যেত। শনিবার পুরো স্কুল। এমনি এক শুক্রবার ছুটির পর স্কুল বোর্ডিং-এ এক বন্ধুর ঘরে বসে অজিত শ্যামা, রঘুবীর কুর্মি প্রভৃতি কয়েকজনের সাথে গল্প হচ্ছিল। সেই নানা কথার মাঝে ওদের বললাম যে, সারা বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে প্রায় সমস্ত স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ফেডারেশন গঠিত হচ্ছে ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে একদিকে ছাত্ররা নিজস্ব সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করার সঙ্গে সঙ্গে 'স্বাধীনতা-শান্তি-প্রগতি'—ছাত্র ফেডারেশনের এই মূল নীতিকে ভিত্তি করে বৃহত্তর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

সারা দেশেই ছাত্র আন্দোলনের জোয়ার বয়ে চলেছে। এই অবস্থায় আমাদের এখানে কিছু করণীয় আছে. না শুধু স্কুলে আসা-যাওয়া ও খেলাধূলা করে গতানুগতিকভাবে দিনগুলি কাটিয়ে দেওয়া। এখানেও ছাত্র ফেডারেশনের একটা কমিটি গঠন করা যায় কিনা সবাইকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করলাম। অজিত আমাকে সমর্থন করে বলল যে গত বছর সমর রায়ের (দশম শ্রেণীর ছাত্র) উদ্যোগে এ ধরনের কাজ কিছুটা অগ্রসর হওয়ার পর হেডমাষ্টার মশাই-এর হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়ে যায়। তিনি চান না যে তাঁর স্কুলের ছাত্ররা বাইরের কোন কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ুক। অনভিজ্ঞতার জন্য প্রথমেই প্রকাশ্যে ভীষণ হৈচৈ হওয়ার ফলে হেডমাষ্টার মশাই সব জানতে পেরে অনেককেই ক্লাস থেকে তাঁর ঘরে ডেকে এনে আচ্ছা করে

ধমকানি দেন। এজন্য অনেকেই ভয়ে সবে পড়ে। সুতরাং আর বেশীদূর এগোনো যায়নি। আমাদের খুব সাবধানে এগোতে হবে। প্রকৃতপক্ষে হেডমাষ্টার শ্রীশচন্দ্র সান্যাল ছিলেন ইংরেজদের একজন খয়ের খাঁ এবং রাজনৈতিক গোয়েন্দা বিভাগের বেসরকারি সংবাদদাতা। জনশ্রুতি ছিল যে তিনি রায়বাহাদুর উপাধি পাওযাব জন্য খুবই সক্রিয়। আমাদের এই আলোচনার কয়েকদিন পর অজিত তার দাদা জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ-এর সঙ্গে দেখা করার জন্য আমাকে অনুরোধ করে। আমি একটু আশ্চর্য্য হয়ে হঠাৎ ওর দাদার সঙ্গে আমাকে দেখা করতে বলার কারণ জিজ্ঞাসা করলে অজিত বলে, আমার দাদা স্বদেশী করে। ১৯৩৬ সালে কুড়িগ্রাম ট্রেন ডাকাতি সম্পর্কে লালমণিরহাটে যে কয়েকজন ছাত্র-যুবককে গ্রেপ্তার করা হযেছিল তাব মধ্যে জ্যোতিদাও ছিলেন। তিন মাসের উপর কুড়িগ্রাম জেলে আটক রেখে প্রমাণাভাবে ছেড়ে দিয়ে দুই বছরের জন্য গৃহবন্দী করে রাখে। এজন্য দাদা সময়মত পরীক্ষা দিতে পারেন নি। গত বছর প্রাইভেট ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছেন। এ সমস্ত কথা জানার পর আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলাম। কারণ বড়দার কাছে শুনেছিলাম যে কুড়িগ্রাম ট্রেণ ডাকাতি অনুশীলন দলের সভ্যদের দ্বারাই সংগঠিত হয়েছিল।

দলের সঙ্গে যোগাযোগ

এখানে আসার পর অনুশীলন দলের কর্মীদের কিভাবে খুঁজে বার করব এজন্য খুবই ছটফট করছিলাম। মনে হচ্ছে আজ হয়ত ঠিক জায়গাতেই গিয়ে পৌছাব।

সন্ধ্যার একটু আগে রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটের মাঠে অজিতের সঙ্গে একটু অপেক্ষা করতেই জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ এসে পড়লেন। অজিত আমার পরিচয় দিলে খুবই উৎসাহের সঙ্গে আলাপ শুরু করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম ঘটনাচক্রে ঠিক জায়গায়ই এসে

পড়েছি। তিনি ঢাকার কয়েকজনের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও নামগুলি জানা ছিল।

ক্রমে জ্যোতিদার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠতে লাগল। তারই সক্রিয় সহযোগিতায় আমরা স্কুলে ছাত্র-ফেডারেশনের কমিটি গঠনের কাজে এগিয়ে যেতে লাগলাম, অবশ্য হেডমাষ্টার মশাই-এর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে।

গ্রীষ্মের ছুটির আগেই রংপুর থেকে সমর রায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সভ্য করার জন্য বিল বই নিয়ে আসেন। বিল বই-এ অবনী লাহিড়ীর নাম সম্পাদক হিসাবে লেখা রয়েছে দেখলাম। এরপর প্রতি ক্লাস থেকেই সভ্য সংগ্রহ করা শুরু হল। যদিও বিধি-সম্মতভাবে কোন কমিটি গঠন করা তখনও সম্ভব হয়নি।

রেভলিউশনারী সোস্যালিষ্ট পার্টি অব ইন্‌ডিয়া

১৯৪০ সালে এপ্রিল মাসের কোন একদিন জ্যোতিদা আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে তাঁর বাড়িতে একটি আলোচনা সভা ডাকেন। সেই সভাতে জানালেন যে গত মার্চ মাসে রামগড়ে আপোসবিরোধী সম্মেলনের সময় অনুশীলন সমিতির সভ্যরা রেভলিউশনারী সোস্যালিস্ট পার্টি অব ইন্‌ডিয়া নামে একটি নূতন দল গঠন করেছেন।

এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনার জন্য অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই রংপুর থেকে মনীশ সেন আসবেন। নৃপেন নন্দীর বাড়ীতে মিটিং হবে। আমরা যেন সেই সভায় অবশ্যই উপস্থিত থাকি।

নৃপেন নন্দীর নাম এই প্রথম শুনলাম। জ্যোতিদা আরও জানালেন যে এখানকার অনুশীলন সমিতির বহু সদস্য সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন। কেউ কেউ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেও আছেন। আমাদের সবারই পরিচিত হরিপদ সেন জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সমাজ-সেবা-মূলক কাজে যথেষ্ট সক্রিয় হলেও রাজনীতিতে কোন আগ্রহ নেই। একটু বয়স্কদের ভিতরে নৃপেন নন্দী এখনও যথেষ্ট সক্রিয় আছেন।

এর অল্প কয়েকদিন পরেই জ্যোতিদা ও কয়েকজন পুরানো কর্মীসহ পনের জনের মত ছাত্র-যুবক নৃপেন নন্দীর বাড়ীর মিটিংএ সমবেত হলাম। পর পর দু'দিন মনীশ সেন ও আরও একজন বিস্তারিতভাবে কোন পরিস্থিতিতে রেভলিউশনারী সোস্যালিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার জন্ম হয় তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন।

ঐ দুইদিনের আলোচনা সভার সারমর্ম আমি যেটুকু বুঝেছিলাম তা হল এই যে, ১৯৩৮ সাল থেকে অনুশীলন সমিতির সভ্যরা কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির মধ্যে নিজদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে কাজ করে যাচ্ছিলেন। ১৯৩৯ সালের ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচনের সময় গান্ধীজীর মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়ার বিরুদ্ধে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সুভাষচন্দ্র বসুকে সমর্থন করেন সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়াব কিছুদিন পরে এ. আই. সি. সি.র অধিবেশনে পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থের একটি প্রস্তাব উত্থাপনের সময় উভয় পার্টি নিরপেক্ষ থেকে ভোটদানে বিরত থাকেন। এর ফলে পন্থজীর প্রস্তাব অধিবেশনে গৃহীত হয়। ঐ প্রস্তাবে ছিল যে নির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীজীর অনুমোদন ছাড়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কোন সদস্য নিবাচন করতে পারবেন না।

কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির ঘোষিত নীতি ছিল—জাতীয় মুক্তি অর্জনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে মার্কসবাদকে ভিত্তি করে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমাদের সুযোগ এনে দিয়েছে ইংরেজের বিরুদ্ধে শেষ আঘাত হানার। সুভাষচন্দ্রের মতে বৃথা সময় নষ্ট না করে বৃটিশের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করে পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হওয়াই এই মুহূর্তের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। এইজন্য তিনি গান্ধীজী সহ কংগ্রেস নেতাদের কাছে বার বার আবেদন জানাতে লাগলেন।

অপরদিকে গান্ধীজী সহ কংগ্রেসের উচ্চ পর্যায়ের নেতাবা যুদ্ধের

সময় ইংরেজকে বিব্রত না করার নীতি গ্রহণ করে সুকৌশলে পন্থ প্রস্তাবের মারফত অগণতান্ত্রিকভাবে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে অপসারিত করেন।

আশা করা গিয়েছিল যে মার্কসবাদে বিশ্বাসী কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী আপোস-কামী নেতৃত্বের চক্রান্তকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করবেন। অত্যন্ত হতাশা ও দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল যে কংগ্রেস সোস্যালিস্টদের সাহস, দৃঢ়তা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবের জন্য জাতীয় ঐক্যের দোহাই দিয়ে সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন না করে তাঁরা কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী ও সাম্রাজ্য-বাদের সঙ্গে আপোসকামী নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।

আর একদিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধের সুযোগে ইংরেজের বিরুদ্ধে আঘাত আনার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেও কার্যক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টাকে সমর্থন না করে দূরে সরে দাঁড়াল। কারণ কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও ছিল নানা দ্বিধা ও দুর্বলতা।

সেইসঙ্গে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে গৃহীত "যুক্তফ্রন্ট" তত্ত্বের যান্ত্রিক উপলব্ধির দরুণ "জাতীয় ফ্রন্ট"-এর মধ্যে ভাঙনের আশঙ্কায় ঐদল কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী আপোসকামী নেতৃত্বকেই শক্তিশালী করে তুলল। এর ফলে জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামের যে বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে ওঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তার পরাজয় ঘটল।

এই পরিস্থিতিতে গত মার্চ মাসে রামগড়ে (বিহার) সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে আপোসবিরোধী সম্মেলনে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত অনুশীলন সমিতির সদস্যরা এক বৈঠকে মিলিত হন। দীর্ঘ আলোচনার পর গত ১৯শে মার্চ (১৯৪০) তারা সিদ্ধান্ত করেন যে মার্কসবাদ লেনিনবাদের প্রতি প্রত্যয়দৃঢ় আমুগত্য নিয়ে এই দেশের মাটিতে উক্ত মতবাদের সৃজনশীল প্রয়োগের জন্য একটি প্রকৃত বিপ্লবী দল গঠনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। অনুশীলন সমিতির প্রাক্তন

সদস্যগণ ঐ প্রয়োজন সাধনের জন্য রেভলিউশনারী সোস্যালিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া (আর, এস, পি, আই) নামে একটি নূতন দল গঠনের সিদ্ধান্ত করেন। দলকে পরিচালনা করার জন্য যোগেশ চ্যাটার্জীকে আহ্বায়ক নির্বাচিত করে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়েছে। এখন থেকে আমাদের পরিচয় হবে আর, এস, পি, আইর কর্মী হিসাবে।

এরপর থেকে আমরাও নিজেদের আর, এস, পি, আই-র কর্মী হিসাবে মনে করতে শুরু করলাম। কিছুদিনের মধ্যেই জ্যোতিদা উদ্যোগ গ্রহণ করেন যাতে আমরা মার্কস্‌বাদের মূল সূত্রগুলো সীমাবদ্ধ-ভাবে হলেও কিছুটা উপলব্ধি করে পারি। কলকাতা থেকে অমূল্য অধিকারীর 'শ্রেণীসংগ্রাম', 'রাশিয়া', 'কমিউনিজম্' আবদুল হালিমের 'বলশেভিক বিদ্রোহ', ধরণী গোস্বামীর 'ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন' প্রভৃতি বইগুলো আনানো হল। আমরা সপ্তাহে অন্তত একদিন ঐ বইগুলো নিয়ে আলোচনাতে বসতাম। জ্যোতিদাই আলোচনাতে প্রধান অংশগ্রহণ করতেন। সেই সময় মার্কস্‌বাদের তাত্ত্বিক দিকগুলো উপলব্ধি করতে না পারলেও একটা অস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠতে শুরু করল। ক্রমশই 'শ্রেণী-সংগ্রাম', 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব', 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র', 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ', 'কমিউনিজম্', 'ঐতিহাসিক', 'যুগসন্ধিক্ষণ' প্রভৃতি শব্দসম্ভারগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে লাগলাম।

আমরা নব উদ্যমে ছাত্রযুবকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার জন্য নিজেদের নিয়োজিত করলাম। ইতিমধ্যে রঘুবীর কুর্মী, অজিত ঘোষ, শ্যাম চক্রবর্তী, চানু বোস, সুনীল মিত্র প্রভৃতিকে নিয়ে আমাদের অজান্তে যেন একদল কর্মী তৈরী হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ছাত্র-যুবক এমনকি রেল কর্মচারীদের মধ্যে দলের প্রভাব বাড়তে শুরু করল। বর্তমান যুগের মত পার্টি মেম্বারশিপের নিয়ম না থাকার দরুণ ঠিক কতজন সদস্য সেদিন দলে ছিল বলতে পারব না।

ইতিমধ্যে ছাত্রদের নিয়ে স্কুলে ছাত্র ফেডারেশন কমিটি তৈরী করার

কাজ শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছে। সেই সময় সমস্ত দল ও মতের ছাত্রদের নিয়ে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন নামে একটি মাত্র সংগঠন ছিল। প্রাদেশিক অফিসটি ছিল ৮/২ ভবানী দত্ত লেন, কলকাতায়।

গোয়েন্দা পুলিশের আগমন

একদিন হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা এক অপরিচিত ভদ্রলোক স্থানীয় অভিভাবকের কাছে এসে আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে যান। তিনি বলেন যে আপনার বাড়ীতে ঢাকা থেকে আগত ছেলেটি গুপ্ত বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত। এখন থেকে যদি দলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ না করে তবে খুবই বিপদ হবে। আমার স্থানীয় অভিভাবক খুব ভদ্র উদার হলেও খুবই ভীতু প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি আমাকে প্রকারান্তরে বলেই দিলেন যে এরকম হলে এ বাড়ীতে থাকা চলবেনা।

এর পরের দিন সকালেই জ্যোতিদাকে সমস্ত ব্যাপারটা জানানোর পর তিনি বললেন যে গত তিন মাসে এখানে এমন কিছুই প্রকাশ্যে করা হয়নি যে সামান্য একজন নবম শ্রেণীর ছাত্রের পেছনে গোয়েন্দা লাগতে পারে। এটা নিশ্চয়ই স্কুলের হেডমাষ্টার মশাই-এর কৌশল। স্কুলের মধ্যে যে ছাত্ররা ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়ে ভবিষ্যতে আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তিনি সেটা বুঝতে পেরেছেন এবং ছাত্রদের মধ্যে থেকে কেউ তাকে জানিয়েছে। তাঁর নিজস্ব কয়েকজন ছাত্র স্কুলের সমস্ত খবরাখবর দিত। যাই হোক কয়েকদিন পর এই ঘটনাটা চাপা পড়ে গেল। আমরা ছাত্র ও যুবকদের নিয়ে ছোট ছোট গ্রুপ মিটিং সমানে চালিয়ে যেতে লাগলাম। একটাই প্রধান বক্তব্য থাকত যে এই যুদ্ধের সুযোগে ইংরেজকে শেষ আঘাত হানতে হবে। কখন কিভাবে এই কাজটি শুরু হতে পারে সে বিষয়ে আমাদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। শীঘ্রই একটা দেশব্যাপী প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হবে এমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস ও আবেগ নিয়ে আমরা উত্তেজনার আগুন পোহাতাম।

গ্রীষ্মের ছুটির পর স্কুলে রীতিমত ক্লাস চলছে। হেডমাষ্টার মশাই ক্লাস থেকে একদিন তার ঘরে আমাকে ডেকে বললেন যে টিফিনের সময় যেন থানায় গিয়ে বিভূতি সাহা নামে আই বি ইন্‌সপেক্‌টারের সঙ্গে দেখা করি। বিভূতিবাবু কিছুক্ষণ আগেই নাকি তাঁর কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন। এখন পরিষ্কার হয়ে গেল যে ছু'মাস আগে সন্ধ্যাবেলায় বাড়ীতে গোয়েন্দা যাবার ব্যাপারে আমাদের হেডমাষ্টার মশাই-এর হাত ছিল। থানা ছিল স্কুলের খুব কাছেই। টিফিনের সময় গিয়ে দেখা করলাম বিভূতি সাহার সঙ্গে। শ্রীসাহা আধঘটা ধরে নানাভাবে ভয় দেখালেন ও উপদেশ দিলেন। শেষ কথা ছিল :— এইসব ছেড়ে দাও নইলে বিপদ হবে।

স্কুলে ফিরে এসে দেখলাম বেশীরভাগ ছাত্রই ঘটনাটা জানতে পেরে গেছে। আমার ধারণা ছিল বন্ধুরা বোধহয় ভীতিগ্রস্থ হয়ে দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দেবে। কিন্তু তা হল না। সবারই মধ্যেই একধরণের জেদ ও দৃঢ়তা এসে গেল। আমরা অনেকটা জেদের বশবর্তী হয়ে ছুটির পর স্কুল-এর মাঠে প্রকাশ্যে ছাত্র আন্দোলন এবং নানা বিষয়ের উপর আলোচনা করতে লেগে গেলাম। হেডমাষ্টার শ্রীশ সান্যাল মশাই সবই বুঝতে পেরে বোধহয় সংগঠিত ছাত্রদের বিরুদ্ধে আর প্রকাশ্যে ভয় দেখান বা অন্য কিছু বলতে সাহস করলেন না।

ইতিমধ্যে দুর্গা পূজা এসে গেল। কাগজ খুলে দেখতে পেলাম কলকাতা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ভারতরক্ষা আইনে বহু রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করা শুরু হয়ে গেছে। এর মধ্যে আর, এস, পি, আই- এর কয়েকজন পরিচিত নেতার নামও দেখতে পেলাম।

একদিন মনীশ সেন আসলেন রংপুর থেকে। তাঁর কাছ থেকে জানতে পারলাম দলের প্রথম সারির নেতাদের বিভিন্ন জেলা থেকে গ্রেপ্তার করা শুরু হয়েছে। এর মধ্যে রংপুর জেলার অন্যতম নেতা সুশীল দেবও আছেন। আরও বললেন, পার্টির অধিকাংশ নেতা

গ্রেপ্তার হওয়াব দরুণ এখন সংগঠনের দাহিত্ব এসে পড়ল যুবক ও ছাত্রদের উপরই। মনে হয় ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার অব্যাহত গতিতে চলতে থাকবে। এজন্য আমাদেরও প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। তিনি আমাদের অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য যেকোন দিন রংপুর যেতে বলে গেলেন। এর কয়েকদিন প.ই রঘুবীরকে নিয়ে রংপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। এখানে পরিচয় হল রংপুর কারমাইকেল কলেজের ছাত্র চুণী মৈত্র, বিনয় দেব, প্রবীণ বিপ্লবী প্রতুল দেব ও শচীন অধিকারী প্রভৃতি কর্মীদের সঙ্গে।

কমিউনিস্ট নেতার সঙ্গে বৈঠক

এই সময়ে (১৯৪০) লালমণিরহাটকে কেন্দ্র করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলছিল। ডাঃ সীতাংশু সেন, নৃপেন ঘোষ, ডাঃ স্যর্যাকান্ত বিশ্বাস প্রভৃতি সবক্ষণের কর্মীরা এখানে থাকতেন। স্থানীয় ছাত্র যুবকদের মধ্যে বিস্তু আর, এস, পি, আই-এর প্রভাবই ছিল বেশী। তখন আর, এস, পি, আই, এর কৃষক বা শ্রমিকদের মধ্যে কোন সংগঠনই ছিল না।

ডাঃ সূর্যকান্ত বিশ্বাস একজন জনপ্রিয় চিকিৎসক ছিলেন। কোন দলীয় সংকীর্ণতা তাঁর মধ্যে না থাকার জন্য আমাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুবই মধুব। একদিন তিনি আমাদের কয়েকজনকে তাঁর বাড়াতে আমন্ত্রণ জানালে রঘুবীর, নিখিল বসু এবং আরও কয়েকজন সেখানে যাই। সেখানে আমাদের সঙ্গে তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন বিশিষ্ট কম্যুনিস্ট নেতা মণিকৃষ্ণ সেনের সঙ্গে। বিশ্বযুদ্ধ, ছাত্র-কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে আলোচনা হল। তিনি বক্তা আমরা শ্রোতা। বেশ কিছুক্ষণ আলোচনার পর আমাদের কোন প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। আমাদের তরফ থেকে প্রশ্ন ছিল, এযুদ্ধের সুযোগে যখন সমস্ত বামপন্থী দলই ইংরেজকে শেষ আঘাত হানার পক্ষে একমত তবে কেন কম্যুনিস্ট পার্টি সুভাষ বসুকে সমর্থন করছেন না?

উত্তরে তিনি বললেন যে সুভাষ বসু শুধু সংগ্রাম-সংগ্রাম করে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু তার কোন রূপরেখা দিচ্ছেন না। আমরা মনে করি যে Local and Partial Struggle এর মধ্যে দিয়ে একদিন আন্দোলন সর্বভারতীয় রূপ নেবে। (সেই সময় পর্যান্ত কম্যুনিস্ট পার্টি বিশ্বযুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হিসাবেই মনে করছিল।) আমরা তাঁর বক্তব্য মেনে নিতে না পারলেও তাঁর প্রকাশভঙ্গিব ও রাজনৈতিক জ্ঞানের গভীরতায় মুগ্ধ হলাম। আলোচনার শেষে চলে আসার সময় আমাদের মধ্যে প্রশ্ন উঠল—হঠাৎ ডাঃ বিশ্বাস কম্যুনিস্ট পার্টির নেতার সঙ্গে আলোচনা সভাতে কেন আমাদের ডাকলেন। মনে হয় তখনও তিনি আমাদের আর, এস, পি, আই, এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা সঠিক জানতেন না।

পূজার ছুটিতে জ্যোতিদা কলকাতা থেকে লালমণিরহাট আসলেন। তাঁর কাছ থেকে জানতে পারলাম যে দলের অধিকাংশ প্রবীণ নেতা ও কর্মীরা ক্রমেই ভারত-রক্ষা আইনের কবলে পড়ে গ্রেপ্তার হচ্ছেন। এখন মূলতঃ যুবক ও ছাত্রদেরই উপরই দলের সমস্ত দায়িত্ব পড়েছে। ছাত্র আন্দোলনের নেতারা এখন দলেরও নেতা। নেতাদের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও ছাত্র কর্মীরা উৎসাহের সঙ্গে সংগঠনের দায়িত্ব তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী পালন করে যাচ্ছেন।

জানতে পারলাম চিত্ত গুহ নামে একজন যুবকর্মী দক্ষিণ কলিকাতায় 'কালচার ক্লাব'-এর মাধ্যমে ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে এক শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলছেন।

পরবর্তীকালে ঐ কালচার ক্লাবের সদস্যরা ৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ক্লাবের বহু সদস্যকেও ভারত-রক্ষা আইনে গ্রেপ্তারের পর ক্লাব ঘরটি পুলিশ তালা-চাবি দিয়ে সীল করে দেয়। শহীদ রামেশ্বর ব্যানার্জী এই ক্লাবের সদস্য ছিলেন। এর আরও কয়েক বছর পর উক্ত কালচার ক্লাবকে কেন্দ্র করেই নূতন রাজনৈতিক দল এস. ইউ. সি -এর জন্মলাভ ঘটে।

স্কুল থেকে বিতাড়ণ

১৯৪০ এর ডিসেম্বর। স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার দু'তিন দিন পর স্থানীয় অভিভাবক একটি দরখাস্ত আমার হাতে দিয়ে হেডমাষ্টার মশাই-এর বাড়ীতে দিয়ে আসতে বললেন এবং আরও জানালেন যে হেডমাষ্টার মশাই তাকে ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন যে নূতন বছরে আমাকে স্কুলে রাখা হবে না। কোন উপায় না থাকায় বাধ্য হলাম ট্রান্সফারের জন্য দরখাস্তটি নিয়ে হেডমাষ্টার মশাই-এর বাড়ীতে যেতে। তিনি খুব খুশী মনে দরখাস্তখানা গ্রহণ করলেন। এককথায় Forced Transfer Certificate দিয়ে বিনা কারণে স্কুল থেকে বিতাড়িত করা হল।

ছাত্র আন্দোলনে ভাঙ্গন

ইতিমধ্যে বড়দিনের ছুটি এসে গেল। একদিন খবরের কাগজে দেখলাম যে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের (A I.S F) নাগপুর সম্মেলনে (ডিসেম্বর ১৯৪০) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্রদের মধ্যে প্রচণ্ড মতবিরোধের জন্য দুটি সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠন সৃষ্টি হতে চলেছে। এর পরে ছাত্র নেতাদের মধ্যে কিছুদিন পর্য্যন্ত খবরের কাগজে বিবৃতির লড়াই শুরু হল। কম্যুনিস্ট পার্টির ও আর, এস, পি, আই-এর তরফ থেকে যথাক্রমে অমিয় দাশগুপ্ত ও অরুণ সেনের নামে বিবৃতিগুলি প্রকাশিত হত। এ, আই, এস, এফ, একই নামে দুইটি সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠনর জন্ম হল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের পুরনো অফিস ৮/২ ভবানী দত্ত লেন সি, পি, আই-এর দখলে রয়ে গেল। পাল্টা বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের অফিস করা হল কলকাতার ১৮ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীটে।

এরই মধ্যে মনীষ সেন রংপুর থেকে এসে আমাদের নিয়ে একটি জরুরী বৈঠক বসালেন। তিনি নাগপুর সম্মলনের পর পাল্টা ছাত্র সংগঠনের জন্ম কেন হল তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে আমাদের বিভিন্ন

খবরের কাগজের কাটিং ও অনেকগুলি ছাপান ইস্তাহার দিলেন। এরই মধ্যে একটি ছিল বরিশালের বি. এম. কলেজের ছাত্রনেতা শাহ আলমের ছবিসহ একটি ইস্তাহার। শাহ আলম নাগপুর সম্মেলন থেকে ফেরার পথে ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত হন।

এই সময় আমরা জানলাম দুটি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠনের মধ্যে একদিকে প্রধানতঃ সি, পি, আই রয়েছে আর একদিকে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর, এস, পি, আই. ও সি. এল. আই (সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন কম্যুনিস্ট লীগ অব ইণ্ডিয়া) প্রভৃতি দলের ছাত্রবৃন্দ।

অরুণ সেনকে কনভেনর নির্বাচিত করে বিভিন্ন দলের ছাত্ররা একটি প্রস্তুতি কমিটি তৈরী করেছে। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই উক্ত কমিটির উদ্যোগে কলকাতায় প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। মনীশ সেন জানালেন যে উক্ত সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্ররা যোগ দেবে এবং লালমণিরহাট থেকেও কয়েক-জনকে ডেলিগেট হিসাবে অবশ্যই যেতে হবে।

কলকাতায় যাত্রা

আমি কলকাতায় চলে যাব ঠিক হল। ফেব্রুয়ারী (১৯৪১) মাসের শেষের দিকে একদিন রংপুর গিয়ে মনীশ সেনের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে অরুণ সেনের কাছে একটি পরিচয় পত্র লিখে বলে দিলেন যে আমি যেন অবশ্যই ৮/৯ই মার্চ (১৯৪১) ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি।

অবশেষে কলকাতা রওনা হবার দিন এসে গেল। এরই মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। পার্টির স্থানীয় নেতা জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ ও নৃপেন নন্দীর সঙ্গে হঠাৎ যোগসূত্র স্থাপন, আর, এস, পি, আই-এর কর্মী হিসাবে স্থানীয় ছাত্র-যুবকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলা, রংপুরে

ছাত্রনেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ, স্কুল থেকে বিতাড়ন প্রভৃতি কথাগুলি কেবল মনে আবর্তিত হচ্ছিল। ইতিমধ্যেই অনেকের সঙ্গে গড়ে উঠেছে গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

রেলওয়ে ষ্টেশনে এসে অপেক্ষা করছি দার্জিলিং মেলের জন্য, অল্পক্ষণের মধ্যেই রঘুবীর, শ্যামা ও অজিত এসে পড়ল। ট্রেন আসতে একটি ইন্টার ক্লাস কামরায় উঠে জানলার ধারে বসে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেন ছেড়ে দিলে বন্ধুরা আমাকে বিদায় জানিয়ে চলে গেল।

রেললাইনের ধারের আকাশছোঁয়া উচু সার্চ লাইট-এর পোষ্টগুলো একটার পর একটা ছেড়ে ট্রেন তীব্রবেগে ছুটে চলেছে পার্বতীপুরের দিকে। সেই সময় মনে হচ্ছিল ছোট্ট শহর লালমণিরহাট ও অন্তরঙ্গ বন্ধুদের ছেড়ে আমিও যেন চিরতরে চলে যাচ্ছি এক অজানার উদ্দেশ্যে।

কলকাতা আমার অচেনা শহর। আবার নূতন ভাবে পরিচয় করে নিতে হবে নানা জনের সঙ্গে। "অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে।"

ভোরবেলা শিয়ালদহ ষ্টেশন। একটি রিক্সাতে রওয়ানা হলাম কলেজ ষ্ট্রীটের উদ্দেশ্যে। হ্যারিসন রোড ও মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়ে শ্রদ্ধানন্দ পার্ক দেখে রোমাঞ্চ অনুভব করলাম খবরের কাগজের দৌলতে এই পার্কের নাম বহুশ্রুত। এখান থেকেই সুভাষচন্দ্র বসু দক্ষিণপন্থী আপোসকামী নেতাদের চক্রান্তে কংগ্রেস থেকে অপসারিত হওয়ার পর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামের উদাত্ত আহ্বান জানান। রিক্সা এসে থামল হ্যারিসন রোডে "ডোমিনিয়ন লজ" নামে একটি হোটেলের কাছে। এখানেই সাময়িকভাবে দাদাদের সঙ্গে থাকতে হবে। দু'তিন দিনের মধ্যেই সাদা পোষাকের এক গোয়েন্দা এসে হোটেলের মালিকের নিকট আমার সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে গেল।

প্রতিদিন সকালে খবরের কাগজ খুলতে ছাত্র সম্মেলন সম্বন্ধে নানা খবর জানতে পারি। কলকাতার রাস্তাঘাটের সঙ্গে কোন পরিচয় না থাকার জন্য কাছেই ছাত্র ফেডারেশনের অফিস ১৮নং মীর্জাপুর

ষ্ট্রীটে যেতে পারছি না। গোয়েন্দা পুলিশ খোঁজ নিয়ে যাবার পর কাউকে জিজ্ঞাসা করতেও ভরসা পাচ্ছিলাম না।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের (১৮ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট) প্রথম সম্মেলন

অবশেষে ৮ই মার্চ (১৯৪১) এসে গেল। খবরের কাগজ মারফত জেনেছি আজই বেলা ২টার সময় ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে সম্মেলন শুরু হবে।

বেলা দুটো বাজতে একাই বেরিয়ে পরলাম সম্মেলনে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। এদিক ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে বসা এক দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করতে ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হল দেখিয়ে দিল। হলের কাছে এসে দেখি তখনও সম্মেলনের কাজ শুরু হয়নি। আমার কাছে ডেলিগেট কার্ড না থাকায় দু'আনা দিয়ে একটি দর্শকের টিকিট কেটে হলে ঢুকলাম। কোন চেনা মুখ চোখে পড়ছে না। হলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় ছয় ফুট লম্বা, দুই গালে ঘন কালো দাড়ি, ডান হাতে লোহার বালা পরা একজন ছাত্র। পরে তার পরিচয় পেয়েছিলাম। নাম দুর্গা গুপ্ত, যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের একজন ছাত্রনেতা। পরবর্তীকালে দুর্গা গুপ্ত বিহারে পূর্ণিয়া জেলার একজন কংগ্রেস নেতা হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মণীশদা ও জ্যোতিদার সঙ্গে দেখা হল। বহুদিন পর জ্যোতিদা আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরলেন। সম্মেলনের কাজ শুরু হল। হলটি ছিল ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা পরিপূর্ণ। প্রথম দিনে সভাপতিত্ব করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যাপক ডঃ হরেন্দ্রনাথ মুখার্জী (পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল)। সভাপতির ভাষণ ও কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার বক্তৃতার পর সভার প্রথম দিনের কাজ শেষ হল।

পরের দিন ৯ই মার্চ বেলা ১টায় সম্মেলনের কাজ ছাত্রনেতা পরমেশ রায়চৌধুরীর সভাপতিত্বে শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ বাদেই হলের সামনে বহু কণ্ঠের শ্লোগান শুনে বেরিয়ে পড়লাম। গেটের সামনে এসে দেখি প্রায় ৩০ জনের মত ছাত্র-যুবক রক্তপতাকা হাতে নিয়ে ক্রমাগত শ্লোগান দিয়ে যাচ্ছে—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ, মেকী সম্মেলন ধ্বংস হোক। এর পরেই সম্মেলনের বিরোধিতা করে বক্তৃতা শুরু করে দিল। হলে ঢোকার গেটগুলি সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বিক্ষোভকারীরাও ঢোকার চেষ্টা না করে কিছুক্ষণ পরে চলে গেল। পরে জানতে পেরেছিলাম যে এই বিক্ষোভকারীরা ছিল সি. এল. আই দলভুক্ত। নাগপুরে এই দল সি. পি. আই-এর বিরোধিতা করলেও পরে সাংগঠনিক ব্যাপারে মতভেদের দরুণ এই সম্মেলনের বিরোধিতা করে। কয়েকজন ছাত্রনেতার বক্তৃতা ও কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণের পর সভাপতি নব-নির্বাচিত কার্য্যকরী সমিতির নাম ঘোষণা করেন।

সভাপতি—অমর গোপাল মন্দী—ফরওয়ার্ড ব্লক, সহ-সভাপতি—মৃগাঙ্ক ঘোষ ও পরমেশ রায়চৌধুরী—আর, এস, পি, আই, কৃষ্ণ চ্যাটার্জী—ফঃ ব্লক (মাদারীপুর গ্রুপ), সাধারণ সম্পাদক—অরুণ সেন (আর, এস, পি, আই), অফিস সম্পাদক—কমল রায়চৌধুরী—আর, এস, পি, আই। আর একজন সহ-সভাপতি ও কার্য্যকরী সমিতির সদস্যদের নাম মনে নেই। এরপর ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি ও গানের পর সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সম্মেলন শেষে রাস্তায় বেরিয়ে দেখি কলকাতার রাস্তার গ্যাস লাইটগুলি জ্বলে উঠেছে। এরপর মনীশদার সঙ্গে গেলাম ৭বি, বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটে ডেলিগেট ক্যাম্পে। কিছু সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন জেলার ডেলিগেটরা আসতে শুরু করলেন। এখানে পরিচয় হল নব-নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক অরুণ সেন ও কয়েকজন ছাত্রনেতার সঙ্গে।

পরের দিন সকালবেলা খবরের কাগজ খুলে দেখি রাত্রি আট ঘটিকায় বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটে ডেলিগেট ক্যাম্পে পুলিশ হানা দিয়ে

দিয়ে আপত্তিকর ইস্তাহার রাখার অভিযোগে দুজন ডেলিগেটকে গ্রেপ্তার করেছে।

১৯৪১ মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে মির্জাপুর ষ্ট্রীটে অবস্থিত সিটি স্কুলে ভর্তি হলাম। হোটেল থেকেই যাতায়াত করছি। দু'একজন ছাত্রের সঙ্গেও পরিচয় হচ্ছে। মনে করেছিলাম যে ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত স্কুলে ছাত্রদের রাজনৈতিক চেতনা, শিক্ষার মান, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ নিশ্চয় উন্নত ধরণের হবে। কয়েকদিনের মধ্যে বুঝতে পারলাম যে সুদূর রেলওয়ে শহর লালমণিরহাট স্কুলই সর্বদিক থেকে বেশী উন্নত ছিল। এজন্য মনে মনে একটু হতাশা বোধ করলাম।

এর মধ্যে রজনী গুপ্ত রোডে বাড়ী ভাড়া ঠিক হওয়াতে আমরা সবাই হোটেল ছেড়ে বাড়াতে এসে থাকতে শুরু করলাম। বাড়ীর খুব কাছেই শ্রদ্ধানন্দ পার্ক। প্রতিদিনই পার্কের ধার দিয়ে যাতায়াত করি। সেই সময় বড় বড় জনসভাগুলি ঐখানে অনুষ্ঠিত হত (এখন যেমন শহীদ মিনার অথবা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড)। প্রায় দিনই সন্ধ্যার পর সভা হতে দেখেছি। বাড়ীর খুব কাছে হওয়াতে অনেক জনসভাতেই উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়েছিল। বক্তাদের মধ্যে নেতাজীর অন্যতম সহকর্মী নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা আমায় মুগ্ধ করত।

আবদুল মালেকের বক্তৃতা

এছাড়া ফঃ ব্লক নেতা কুমিল্লার আবদুল মালেকের খাঁটি বঙ্গজ ভাষায় বক্তৃতা আজও মনে আছে। একদিন মালেক সাহেব হাঁটুর সামান্য নীচে পাজামা ও হাফহাতা পাঞ্জাবী পরে মঞ্চে উঠে বক্তৃতার মাঝে বলতে শুরু করলেনঃ 'পৃথিবীর হগ্‌গল মানুষ স্বাধীনতা বোগ করতে পারে আর আমরা স্বাধীনতা চাওন মাত্রই ইংরাজের গায়ে বিষম পোড়ানি লাগে। যতই তাগো পোড়ানি লাগুক আর লাঠিগুলি চালাউক আমরা স্বাধীনতার রাস্তায় আউগাইয়া যামুই যামু।' তাঁর

বক্তৃতা শুনে সভাস্থল ঘন ঘন করতালি ও অট্টহাসিতে মুখরিত হয়ে উঠত।

ছাত্র ফেডারেশনের অফিস ১৮ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, স্কুলের কাছেই থাকাতে ছুটির পর অফিস খোলা দেখলেই সেখানে যেতাম। ক্রমে রণেন গোস্বামী, নগেন ভট্টাচার্য, ত্রিবেণী বর্দ্ধন, শান্তি সিংহ রায়, চিত্ত বল, বরেণ দাঁ প্রভৃতি অনেক ছাত্রনেতা ও কর্মীদের সঙ্গে পরিচিত হলাম। সেই সময়ের পার্টির অন্যতম নেতা প্রয়াত সুবোধ দাস, শ্রমিক কর্মী ভবতোষ দত্ত, পরিমল ভট্টাচার্য-এর সঙ্গেও পরিচয় হয়।

সাব-কমিটি

এই সময় একদিন ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অরুণ সেনের সভাপতিত্বে ফঃ ব্লকের দুজন ও আর, এস, পি, আই-এর তিনজন মোট পাঁচজন ছাত্র নিয়ে স্কুল ছাত্রদের সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে স্কুল ষ্টুডেন্টস সাব-কমিটি গঠিত হল। ফঃ ব্লকের দুজনের নাম মনে নেই। আর, এস, পি, আই-এর পৃথ্বীশ রায়চৌধুরী, ভবানী ভট্টাচার্য (বর্তমানে আর, এস, পির নেতা ভবানী ভট্টাচার্য নন্) ও নির্মল রায়চৌধুরী (আহ্বায়ক)।

কিছুদিন আগেই গার্লস্ ষ্টুডেন্টস সাব কমিটি গঠিত হয়েছে। কনভেনর ছিলেন বনলতা সেন (অবশ্য নাটোরের নয়, বরিশালের)। শ্রীমতী সেন ১৯৪২-এর অগাস্ট আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে কয়েক বছর জেলে বন্দিনী ছিলেন। বনলতা সেনের (চক্রবর্তী) ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৬৮ বছর বয়সে মৃত্যু হয়।

ছাত্রনেতারা বহিষ্কৃত হলেন

১৯৪১ সালের জুন মাসের এক সকালে খবরের কাগজ আসতেই দেখলাম যে ভারতরক্ষা আইনের বলে ইংরেজ সরকার বহু ছাত্রনেতাকে কলকাতা থেকে বহিষ্কার করে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যার যার নিজস্ব

জেলাতে চলে যেতে নির্দেশ দেয়। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের বাসিন্দা। ছাত্র ফেডারেশন, ১৮ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীটের সভাপতি অমর নন্দী, সাধারণ সম্পাদক অরুণ সেন, সহ-সভাপতি মৃগাঙ্ক ঘোষ, পরমেশ রায়চৌধুরী, অফিস সম্পাদক কমল রায়চৌধুরী এবং নগেন ভট্টাচার্য প্রভৃতি ছাত্রনেতারা এবং ছাত্র ফেডারেশন ৮/২ ভবানী দত্ত লেনের অমিয় দাশগুপ্ত, প্রশান্ত সান্যাল এবং আর কয়েকজন ছাত্রনেতাও বহিষ্কৃতদের মধ্যে ছিলেন।

এই দিন বিকেলে ছাত্র ফেডারেশন অফিসে ঢোকার পথেই দেখলাম উল্টোদিকের ফুটপাথে কলেজ স্কোয়ারে রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু সংখ্যক সাদা পোষাকের গোয়েন্দা ও লাল পাগড়ীর পুলিশ। অফিসে গিয়ে দেখি বহিষ্কৃত ছাত্রনেতারা ছাড়াও অনেক কর্মী উপস্থিত হয়েছেন। কার্য্যকরী সমিতির এক জরুরী সভা ডাকা হয়েছে। এদিনের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী সভাপতি কৃষ্ণ চ্যাটার্জী (ফঃ ব্লক), সাধারণ সম্পাদক রনেন গোস্বামী এবং অফিস সম্পাদক ত্রিবেণী বর্দ্ধন নির্বাচিত হলেন। দুজনেই আর, এস, পি, আই দলভুক্ত।

এরপর বহিষ্কৃত ছাত্রনেতারা যে যার জেলাতে চলে গেলেন। এর কিছুদিনের মধ্যে আমরা অনুভব করলাম যে গোটা নেতৃত্বকেই বহিষ্কারের দরুণ একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্র কর্মীদের প্রতিদিন আসা-যাওয়া অনেক কমে গেল। সম্পাদক, অফিস সম্পাদক ত্রিবেণী বর্দ্ধন ও ছাত্রকর্মী বরেণ দাঁ নিয়মিতভাবে অফিসে আসতেন।

জার্মানীর সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ

গ্রীষ্মের ছুটি তখনও চলছে। বিকালের দিকে ছাত্র ফেডারেশনের অফিসে আসার সময় মির্জাপুর ষ্ট্রীটে ফেবারিট কেবিনের সামনে একটা জনতার ভীড় লক্ষ্য করলাম। খবরের কাগজের কয়েকজন হকার চিৎকার করে বিশেষ বুলেটিন বিক্রি করছে। এই ভীড়ের মধ্যেই একটি বুলেটিন দু'পয়সা দিয়ে কিনে দেখতে পেলাম বড় বড়

হেডিং-এ লেখা—গতকাল ২২শে জুন'৪১ গভীর রাত্রে জার্মানি দুদেশের অনাক্রমণ চুক্তি ভেঙ্গে হঠাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করেছে। জার্মান বাহিনী সোভিয়েত সীমান্তের অনেকটা দখল করে নিয়েছে। পাতা জুড়ে হিটলারের ছবি। হিটলার ঘোষণা করেছেন যে ইউরোপ তথা সমস্ত বিশ্বকে বলশেভিক আতঙ্ক থেকে মুক্ত করার জন্যই তিনি রাশিয়া আক্রমণ করে জীবনের এক মহান কর্তব্য পালন করলেন। সেই সময় সমস্ত কলকাতায় প্রচণ্ড উত্তেজনা বিরাজ করছিল। এই আক্রমণের সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস সবারই জানা।

স্কুলে ছাত্রদের কনভেনশন

১৯৪১ সালের জুলাই মাসে উত্তর কলকাতা আর্য্য সমাজ হলে ছাত্রনেতা অমর মুখার্জির সভাপতিত্বে স্কুল ছাত্রদের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ জনের মত ছাত্র উপস্থিত হলেও আমাদের কাছে এক সফল কনভেনশন হিসাবেই মনে হয়েছিল। ছাত্রদের উপস্থিতির সংখ্যা যাই হোক না কেন সভার কার্য্য বিবরণী নেবার জন্য স্পেশাল ব্রাঞ্চের সর্টহ্যাণ্ড রিপোর্টার ও হলের বাইরে সাদা পোশাকের গোয়েন্দার সংখ্যার কমতি ছিল না।

সিটি স্কুলে প্রথম যে দুজন ছাত্রকে আন্দোলনে সামিল করতে পেরেছিলাম তার মধ্যে ছিল কার্তিক নাগ ও শুভেন্দু সেনগুপ্ত। এর পর ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে স্কুলে অনেক ছাত্রই কর্মী হিসাবে এসেছিল। প্রয়াত কর্তিক নাগ '৪২ এর আন্দোলনে গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘদিন দমদম সেণ্ট্রাল জেলে বন্দী ছিলেন।

জুলাই মাসে একদিন দুপুরে হঠাৎ প্রায় ২০ জনের মত ছাত্র মিছিল করে সিটি স্কুলের তিন তলায় এসে হাজির হয়। বারান্দার বেঞ্চিতে দাঁড়িয়ে এক দীর্ঘদেহী ছাত্রনেতা ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা শুরু করলেন। সি, পি, আই পরিচালিত নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এম, এ, ফারুক্কিকে কলকাতায়

গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ছাত্র ফেডারেশন (৮/২ ভবানী দত্ত লেন) ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। স্কুলের ছাত্রদেরও ঐ ধর্মঘটে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছিলেন। সেদিনের বক্তা ছিলেন ছাত্রনেতা সন্তোষ ভট্টাচার্য্য (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য)। স্কুলের গেট বন্ধ হয়ে যাওয়াতে ছাত্রদের কেউ ধর্মঘটে যোগ দিতে পারে নি।

অন্তিম শয্যায় রবীন্দ্রনাথ

একদিন দুপুরবেলা ক্লাস চলাকালীন খবর এল যে দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছে। স্কুল ছুটি হয়ে গেলে বাইরে আসতেই দেখতে পেলাম রাজপথ জনতরঙ্গে উত্তাল হয়ে উঠেছে। আবেগে থর থর করে কাঁপছে মহানগরী। ছাত্র ফেডারেশন অফিসে এসে দেখি অনেকেই ইতিমধ্যে এসে পড়েছেন। কিছুক্ষণ পর আমরা ফেডারেশনের ফেষ্টুন ও ফুলের তোড়া নিয়ে গেলাম সিনেট হলের সামনে। প্রায় দেড় ঘণ্টা অপেক্ষার পর দেখতে পেলাম সামনে পেছনে লক্ষ লক্ষ মানুষ, মাঝখানে লরীতে অন্তিম শয্যায় শায়িত রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে আসছেন। শোক মিছিল সিনেট হলের সামনে থামলে সংগঠনের পক্ষ থেকে ত্রিবেণী বর্দ্ধন ফুলের তোড়া রেখে আসলেন শায়িত কবির সামনে। জীবিত অবস্থায় কবিকে দেখার সুযোগ হয়নি। অন্তিম শয্যায় শায়িত কবি-দর্শনই হয়ে রইল আমার সারা জীবনের পাথেয়।

জয়প্রকাশ নারায়ণের গোপন চিঠি

১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেউলী বন্দীনিবাসে আটক জয়প্রকাশ নারায়ণের একটি গোপন চিঠি যেভাবেই হোক গোয়েন্দা বিভাগের হাতে ধরা পড়ে। গভর্ণমেণ্ট উদ্দেশ্যমূলকভাবে সেই চিঠি দেশের সমস্ত দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ করে দেয়। ঐ চিঠি প্রকাশের পর জনসাধারণ ও রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি

হয়েছিল। আজও স্পষ্ট মনে আছে ঐ চিঠির এক জায়গায় ছিল যে বাংলাদেশে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির অগ্রগতির জন্য নির্ভর করতে হবে অনুশীলন সমিতির উপর।

একই সময় জেল থেকে জয়প্রকাশ সুভাষচন্দ্রকে গোপনে এই মর্মে একটি চিঠি লেখেন যে তাদের দল ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনের সময় পন্থ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট না দিয়ে যে ঐতিহাসিক ভুল করেছিল তার প্রতিকার কিভাবে করা যায়। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের কাছে ঐ চিঠি পৌঁছনোর বহু আগেই তাঁর মহানিষ্ক্রমণের ঘটনা ঘটে গেছে।

এর মধ্যে ছাত্র ফেডারেশনের (১৮নং মির্জাপুর স্ট্রীট) অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক রণেন গোস্বামী ও ছাত্রনেতা শান্তি সিংহরায়কে ইংরেজ সরকার কলকাতা থেকে বহিষ্কার করে নিজ নিজ জেলাতে চলে যাওয়ার জন্য এক আদেশ জারী করে। দুই ছাত্রনেতা বহিষ্কারের ফলে সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ল অফিস সম্পাদক ত্রিবেণী বর্দ্ধনের উপর। ত্রিবেণীদার সঙ্গে তখন বিভিন্ন খবরের কাগজের অফিসে যেতে হত, ৩৭ নং কলেজ স্ট্রীটে খারিজ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি (Suspended B P.C.C) ও ফরওয়ার্ড ব্লক অফিস অবস্থিত ছিল। সেখানে ত্রিবেণীদার সঙ্গে মাঝে মাঝে যেতাম। ঐ অফিসে প্রথম দেখলাম হেমন্ত বসু, অশ্বিনী গাঙ্গুলী ও বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা মাদারিপুরের পূর্ণ দাস মশাইকে।

লক্ষ লক্ষ মানুষ কলকাতা ছাড়ল

১৯৪১ সালে ডিসেম্বর মাসে বিশাল এবং দুর্ভেদ্য বলে প্রচারিত বিখ্যাত বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ 'প্রিন্স অব ওয়েলস্' জাপানী বিমান আক্রমণের ফলে সিঙ্গাপুরের কাছে প্রশান্ত মহাসাগরের অতল তলে তলিয়ে যায়। এই দুর্ভেদ্য বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্-এর পতনের খবরে সেদিন ভারতীয়রা যুগপৎ বিস্ময়, ভয় ও আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ল। শতাব্দীর উপর পরাধীন ভারতবাসীর মন

বৃটিশ শক্তির পরাজয়কে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

মহাযুদ্ধ ভারত তথা বাংলাদেশের গায়ে এসে গেল। এর অল্প কিছু-দিনের মধ্যেই পতন ঘটল ইন্দোনেশিয়া, মালয় ও সিঙ্গাপুরের। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পরাজিত করে ঐ সমস্ত দেশগুলি জাপানী সাম্রাজ্য-বাদীদের দ্বারা পদানত হল। এরপর জাপানী বাহিনী দ্রুত ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকলে কলকাতার মানুষের মধ্যে ভাবনা শুরু হয় যে কলকাতা বা চট্টগ্রামে যেকোন মুহূর্তেই জাপানীরা বিমান আক্রমণ করতে পারে। জাপানী আক্রমণ সম্বন্ধে নানা গুজব ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ কলকাতা থেকে পালাতে শুরু করল। স্কুল-কলেজ অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। বহু মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে প্রাণভয়ে পালাতে লাগল। দিবারাত্র শিয়ালদহ ও হাওড়া ষ্টেশনে কলকাতাত্যাগী মানুষের ভীড়ে উপচে পড়তে শুরু করল। কর্তৃপক্ষ অনেক স্পেশাল ট্রেনের বন্দোবস্ত করেছিল কলকাতাত্যাগী যাত্রীদের জন্য।

এই সময় আমরাও কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। একটিমাত্র ঘর রেখে বাকি দুটি ছেড়ে দেওয়া হল। কয়েকদিনের মধ্যে রওনা হব লালমণিরহাটের উদ্দেশ্যে। এমনি একসময় একদিন খুব ভোরবেলা ত্রিবেণী বর্দ্ধন এসে ঘরে ঢুকেই জানালা দুটি বন্ধ করে দিতে বললেন। চেয়ে দেখি দুজন সাদা পোষাকের ও একজন লাল পাগড়ীর পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জানালেন যে সরকারের আদেশে তাঁকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাঁর এই বহিস্কারের খবরটি গোয়েন্দাদের দৃষ্টি এড়িয়ে কয়েকটি জায়গায় পৌঁছে দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। ত্রিবেণীদা চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই আমিও গোয়েন্দা পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে প্রথমেই গেলাম সিমলা ষ্ট্রীটে ছাত্রনেত্রী নির্মলা রায় ও সুষমা রায়ের বাড়ীতে। সেখান থেকে আরও কয়েকটি জায়গায় খবর দিয়ে একটু বেলার দিকে ফিরে এলাম।

এর কিছুদিন আগেই রিপন কলেজের ছাত্র রাজশাহীর] গোপাল চক্রবর্তীকেও কলকাতা থেকে সরকার বহিস্কার করেছে। গোপালবাবু কলকাতা ছেড়ে যাবার আগে তাঁর সঙ্গে কোন যোগাযোগ হয়ে ওঠেনি। তিনি স্কট লেনে একটি বাড়ীতে থাকতেন। একই বাড়ীতে গিরীশ চক্রবর্তী নামে একজন শিক্ষকের একটি কোচিং স্কুল ছিল। তাঁর কাছে তখন অনেক সাহিত্যিকেরই যাতায়াত ছিল, মাঝে মাঝে সাহিত্য পাঠের আসর বসত। ১৯৪১ সালের কোন এক সন্ধ্যায় সাহিত্য পাঠের আসরে আমরা অনেকেই আমন্ত্রিত হই। সেখানে প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রয়াত সুবোধ ঘোষ তাঁর বিখ্যাত গল্প 'ফসিল' পাঠ করে শুনিয়েছিলেন।

১৯৪৫ সালের শেষের দিকে সুবোধ ঘোষ ও সজনী কান্ত দাস বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের অফিসে (১৮নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট) ছাত্রদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে "স্বাধীনতা আন্দোলন ও সাহিত্যিকদের ভূমিকা" নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আবার লালমণিরহাট

জনযুদ্ধ

১৯৭২ সালের জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে বাড়ীর সবাই আবার লালমণিরহাট চলে আসি। একখানা ঘরে দুই দাদা থেকে গেলেন। লালমণিরহাটে কয়েকদিন দিদির বাড়ীতে থেকে ২৫নং গোশালা বাজারে বাড়ী ভাড়া করে বসবাস শুরু করলাম। আবার পুরানো বন্ধুদের মাঝে ফিরে এসে খুবই আনন্দ হল। বন্ধুরাও আমাকে পেয়ে খুব খুশী।

জার্মানী সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণের কয়েকমাস পরেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' হিসাবে ঘোষণা করে। এই পার্টির মতে নাৎসী জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণের ফলে বিশ্বযুদ্ধের এক গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেছে। এই মুহূর্তে পৃথিবীর সমস্ত শ্রমজীবী তথা শান্তিকামী প্রগতিশীল মানুষের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হল যুদ্ধ প্রচেষ্টায় মিত্রশক্তিকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করা এবং যেকোন প্রকারে সোভিয়েট ইউনিয়নকে রক্ষা করা মহাযুদ্ধের শুরুতেই বিপ্লবী এম, এন, রায় পরিচালিত র‍্যাডিকেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এই যুদ্ধকে ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ হিসাবে ঘোষণা করে এবং পরাধীন দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহাসিক প্রযোজনীয়তাকে মূলতঃ অস্বীকার করে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ইংরেজদের সহযোগিতা করার জন্য জনগণকে আহ্বান জানায়। দুই বৎসর পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এম, এন, রায়ের তত্ত্বেরই প্রতিধ্বনি করে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান নির্দ্ধারিত করল।

১৯৪১ সালে ডিসেম্বর মাসে পাটনায় অনুষ্ঠিত সি, পি, আই পরিচালিত নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সর্বভারতীয় সম্মেলন এই যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' হিসাবে ঘোষণা করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। ঐ দিনই সন্ধ্যাবেলায় অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে এই প্রস্তাব ইংরেজ সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রচার করতে শুরু করে। ঐ প্রচারের মূল বক্তব্য ছিল যে ভারতের ছাত্রসমাজ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বিনা শর্তে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। আর, এস, পি, আই তার মূল রণনীতি 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত কর' এই পূর্ব সিদ্ধান্তেই অটুট রইল।

কমিউনিস্টদের কারামুক্তি

সি, পি, আই-এর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের দরুণ ইংরেজ সরকার ঐ দলের বিনাবিচারে আটক সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়। হিজলী বন্দীশিবির থেকে পলাতক বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী ও নৃপেন চক্রবর্তীর উপর থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা তুলে নেওয়া হয়। এরপর কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে ইংরেজ সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিলে আইনসঙ্গত দল হিসাবে কাজ করতে অনুমতি প্রদান করে।

নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের নেতৃত্বাধীন লেবার পার্টিতেও ভাঙ্গন শুরু হ দত্ত মজুমদার ব্যাতীত দলের অধিকাংশ সভ্যই এই যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' হিসাবে ঘোষণা করলে বিশ্বনাথ দুবে, প্রমোদ সেনগুপ্ত প্রভৃতি নেতারাও জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন।

এই দলের বৃহত্তর কলকাতার শ্রমিকশ্রেণী ও ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

নিষ্প্রদীপ কলকাতায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি

১৯৪২ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় আসি

এসে দেখতে পেলাম বহু স্কুল, কলেজ, দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এমন কি সিনেমা হলগুলি পর্য্যন্ত বন্ধ। ট্রাম-বাসের যাত্রী ও রাস্তায় লোক চলাচল খুবই সীমিত। অন্ধকারাচ্ছন্ন মহানগরীকে দেখে মনে হল যেন এক সুদূর মফঃস্বলের কোন শহর।

আর, এস, পি, আই-এর নেতৃস্থানীয় অধিকাংশ কর্মী তখন ভারত-রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে বন্দী। যুদ্ধের হিড়িকে অনেকেই কলকাতা ত্যাগ করে চলে গেছেন। আবার কেউ কেউ গ্রেপ্তার এড়িয়ে আত্মগোপন করে দলীয় সংগঠনের কাজ চালিয়ে যেতে চেষ্টা করছিলেন।

এই সময় ছাত্র ফেডারেশনের (১৮নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট) অস্থায়ী সম্পাদক ছিলেন বিনয় রায়। উত্তর কলকাতার কর্মী বরেন দাঁ, বীরেন সেন, গোপেশ্বর দাঁ, প্রহ্লাদ দে, কার্তিক নাগ, শচীন সেন প্রভৃতি কর্মীরা ছাত্র ফেডারেশনের অফিসটি নিয়মিত খোলা রেখে দলের সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ

পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য সেই বৎসর আর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়া না হওয়ায় মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। পারিবারিক কাজে আমাকে একবার ঢাকা যেতে বলায় সানন্দে রাজী হয়ে কলকাতা থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হই। সেখানে তখন পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন কালচার ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রথীন সেন। ঢাকায় এসে তারই মাধ্যমে পরিচিত হই সেই সময়ের বিশিষ্ট ছাত্রনেতা চিন্ময় বসু, অরুণ দাশগুপ্ত এবং মিহির ভট্টাচার্য, অনিল ভট্টাচার্য প্রভৃতি কর্মীদের সঙ্গে। ঢাকার অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় কর্মীই বিনাবিচারে জেলে বন্দী থাকা সত্ত্বেও দলের সংগঠন যথেষ্ট শক্তিশালী মনে হয়েছিল। ঢাকা শহরের ছোট ছোট কারখানা এবং নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন সূতাকলে দলের সংগঠন ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। সেযুগে বাংলাদেশের মধ্যে আর, এস,

পি, আই শুধু ঢাকা জেলাতেই শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। জানতে পারলাম নির্মল সেন এক বছরের উপর আত্মগোপন করে আগামীদিনের সংগ্রামের জন্য দলকে সংগঠিত করার কাজে লিপ্ত আছেন।

প্রকৃতপক্ষে ঢাকা শহর ছিল দলের দ্বিতীয় কেন্দ্র। দলের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে সম্ভব হলে নির্মল সেন উত্তর-বঙ্গের জেলাগুলির সঙ্গে দলের বিচ্ছিন্নপ্রায় যোগাযোগকে আবার সংযুক্ত করার জন্য প্রথমে লালমণিরহাট যাবেন। যাবার আগে খবর দেওয়ার জন্য একটি গোপন ঠিকানাও দেওয়া হল।

জ্যোতিদার মৃত্যু

এক সপ্তাহ পর ঢাকা থেকে লালমণিরহাট চলে আসি। ১৯৪২ সালের ফেরুয়ারী মাসের শেষের দিকে জ্যোতিদার মৃত্যু হয়। প্রায় একবছর যাবত তিনি টি বি রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে মাত্র বাইশ বছর বয়সে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর মৃত্যুতে রংপুর জেলার দলীয় সংগঠনের কাজ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম সময়ের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, বন্ধু ও অগ্রজপ্রতিম জ্যোতিদার স্মৃতি আজও মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

অখিল দাস ও সোমেন চন্দ নিহত

খবরের কাগজের মারফত জানতে পারলাম যে গত ৮ই মার্চ সি, পি, আই-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ঢাকা শহরে ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলনের মণ্ডপের সামনে সমস্ত বামপন্থী জাতীয়তাবাদী দলগুলি বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ঐ দলগুলির উদ্দেশ্য ছিল সি, পি, আই-এর 'জনযুদ্ধ' নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো।

এই সময় বিক্ষোভকারীদের সম্মেলন মণ্ডপের কাছ থেকে ছত্রভঙ্গ

করে দেওয়ার জন্য আই, বি, পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর হিমাংশু ভট্টাচার্য রিভলবার থেকে গুলি চালালে প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও আর, এস, পি, আই কর্মী অখিল দাসের দেহ লুটিয়ে পড়ে রাজপথে।

অখিল দাসের মৃত্যুতে স্বভাবতঃই প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সেই মুহূর্তে বিক্ষোভকারীদের হাতে তরুণ কমিউনিস্ট ও উদীয়মান সাহিত্যিক সোমেন চন্দ নিহত হন।

এ ঘটনার পর থেকেই সি, পি, আই তার সমস্ত শক্তি সংগঠিত করে সারা দেশে প্রচার শুরু করে দেয় যে ফ্যাসিস্টদের দোসর জাপানী দালালদের হাতে সোমেন চন্দ নিহত হয়েছে। ইংরেজের বেতনভুক কর্মচারীর হাতে প্রবীণ স্বাধীনতাসংগ্রামী অখিল দাসের নিহত হওয়ার কথা উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন বোধ করেনা।

মতাদর্শগত সংঘাত

প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকে শুরু হয় অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির বিশেষভাবে আর, এস, পি, আই-এর সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির এক তীব্র রাজনৈতিক সংঘাত। আর, এস পি, আই-এর ছাত্র-যুব কর্মীরা অনেক সীমাবদ্ধতা নিয়েও মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রামে। অবিরাম প্রচার চালিয়ে যায়, সি, পি, আই-এর ভুল রাজনৈতিক অবস্থানের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে।

১৯৪২ মাসের প্রারম্ভেই সি, পি, আই যুদ্ধপ্রচেষ্টায় জনগণকে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য ব্যাপক প্রচারকার্য আরম্ভ করে। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায়, মহকুমায়, গঞ্জে, হাটে, বাজারে দলের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধের সমর্থনে জনমত সংগঠিত করার জন্য। তাদের প্রধান শ্লোগান হল 'জাপানকে রুখতে হবে', 'উৎপাদন বাড়াতে হবে', 'আমাদের হাতে রাইফেল দাও'। যুদ্ধের সমর্থনে জনসভাগুলিতে একটি গান খুবই প্রচলিত ছিল—

"কমরেড ধর আজি হাতিয়ার / এযুদ্ধ নহে আজি একলার / বিপ্লবী সোভিয়েট, বীর চীন / সাথে আছে ইংরেজ মার্কিন।"

নবপরিচয়

১৯৪১ সালের মার্চের শেষে এক সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পূর্ববাংলার কোন এক ছোট জেলাশহরে যেতে হয়েছিল। অনুষ্ঠানের পরেরদিন ভোরবেলায় শহরে একটু ঘোরাঘুরি করতেই এক পুরানো সহপাঠীর সঙ্গে দেখা হওয়াতে তার সঙ্গে গল্পে মশগুল হয়ে পড়ি। সময়ের কোন খেয়াল ছিল না। এমন সময় একটি ছেলে খুঁজতে খুঁজতে ঐখানে এসে বাড়ীতে যেতে বলল। বাড়ীতে যেতেই একজন আমাকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে শুরু করলেন। সেই সময় আমারই সমবয়সী একটি মেয়ে হঠাৎ এসে আমাকে নমস্কার জানিয়ে বলল, এতক্ষণ কোথায় ছিলেন—কোন স্বদেশীবন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল বোধহয়। অনেকটা যেন সেই ···"পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে"। 'স্বদেশী' কথাটা শুনেই বুঝে নিলাম ইতিমধ্যেই আমার সম্বন্ধে কিছু খবর জেনে একটা ধারণা করে নিয়েছে। আচমকা একটি মেয়ের এধরণের প্রশ্নে খুবই সঙ্কুচিত হয়ে গেলাম। অপরিচয়ের প্রথম ভাবটা কেটে গেলে সহজভাবেই আলাপ শুরু হল। শুনলাম ওর এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এই শহরেরই জেলে গত কয়েক মাস যাবৎ রাজবন্দী হিসাবে রয়েছেন। পারিবারিক পরিবেশের জন্যই হয়ত ওকে কিছুটা রাজনৈতিক সচেতন বলে মনে হল। আমাদের মধ্যে গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র থেকে গোর্কির 'মা', অমলেন্দু দাশগুপ্তের 'ডেটিনিউ', এবং শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' নিয়ে আলোচনা করতে করতে কখন যে সকাল গড়িয়ে দুপুর এসে পড়েছে জানতেও পারি নি। আমাদের অজান্তেই যেন গড়ে উঠল এক নিবিড় নৈকট্যের সম্পর্ক। সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরে আসার জন্য স্টেশনে এসে পৌছলাম। বাড়ীর অন্যান্যদের সঙ্গে সেই সদ্য-পরিচিতা মানসীও আসল স্টেশনে বিদায়

সম্ভাষণ জানাতে। ট্রেনের দেড় ঘণ্টা দেরীতে আসার খবর শুনে স্টেশনের একপ্রান্তে গিয়ে একটি বেঞ্চিতে বসলাম। গল্পে গল্পে কখন যে ট্রেন এসে পড়েছে কেউই বুঝতে পারিনি। চলে আসার আগে বললাম, আজকের এই দিনটির কথা চিরদিন মনে থাকবে। উত্তরে মানসী বলল, আমাদের পরিচয় কি এখানেই শেষ ? এরপর পরস্পরের ঠিকানা বিনিময় করে পরবর্তী সময়ে উভয়েই চিঠি লিখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলাম।

লালমণিরহাট ফিরে আবার দলীয় সংগঠনে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। একদিন হঠাৎ অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই মানসীর চিঠি আসল ; লিখেছে, জীবনের যে আদর্শকে লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছেন তা আপনাকে নিয়ে যাবে ক্রমাগত সাফল্যের পথে। সাবলীল ভাষায় আন্তরিকতাপুর্ণ চিঠি পেয়ে এক অনাস্বাদিত আনন্দে মন ভরে উঠল। কয়েকদিনের মধ্যে চিঠির উত্তর দিলাম।

ব্রহ্মদেশ প্রত্যাগত ভারতীয়দের দুর্ভোগ

১৯৪২-এর মার্চে রেঙ্গুন তথা ব্রহ্মদেশ ইংরেজদের পরাজিত করে জাপানীরা দখল করে নেয়। রেঙ্গুন পতনের পর হাজার হাজার ভারতীয় দুর্গম পাহাড় ও অরণ্য পথে অবর্ণনীয় কষ্টভোগ করতে করতে আসাম, চট্টগ্রাম, কলকাতা প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগল। আসাম থেকে হাজার হাজার ব্রহ্মদেশ প্রত্যাগত যাত্রীদের নিয়ে অনেক ট্রেন থামত লালমণিরহাট জংশনে। আর, এস, পি, আই-এর কর্মী ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে যাত্রীদের পানীয় ও খাদ্যদ্রব্য দিয়ে সাহায্য করতেন।

পণ্ডিত নেহেরুকে সংবর্দ্ধনা

এপ্রিল মাসে একদিন শুনতে পেলাম পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু গৌহাটী যাচ্ছেন কংগ্রেসের কোন সভাতে যোগ দিতে। গৌহাটীর

পথে লালমণিরহাট জংশনে আসাম মেল প্রায় পনের মিনিট থামে। আমরা ঠিক করলাম স্টেশনে পণ্ডিতজীকে সংবর্ধনা জানানো। রাত্রি প্রায় আটটার সময় ট্রেন এসে থামল স্টেশনে। প্রায় ৫০/৬০ জন ছাত্র-যুবক জাতীয় পতাকা নিয়ে স্টেশনে উপস্থিত হলাম। কমিউনিস্ট পার্টি থেকেও বহু লোক এসেছে এই উদ্দেশ্যে। ট্রেন এসে থামলে দেখতে পেলাম একটি সেকেণ্ড ক্লাস কামরার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন পণ্ডিত নেহেরু। 'জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ', 'পণ্ডিত নেহেরু জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে জায়গাটি মুখরিত হয়ে উঠল।

নিষ্প্রদীপের দরুণ স্টেশনের আলোগুলি মিট্‌মিট্ করে জ্বলছিল। একজন একটি পেট্রোমাক্স উঁচুতে তুলে ধরলেন। জনতার অনুরোধে পণ্ডিতজী তৎকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। ভাষণ শেষে স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ডাঃ সূর্য্যকান্ত বিশ্বাস পণ্ডিতজীর অনুমতি নিয়ে কিছু বলতে চাইলেন। তিনি অনুমতি দিলে ডাঃ বিশ্বাস চোস্ত হিন্দিতে সেই সময়ের কমিউনিস্ট পার্টির জনযুদ্ধের রাজনীতিই প্রশ্ন আকারে রাখলেন। পণ্ডিতজী খুব মনযোগ সহকারে ডাঃ বিশ্বাসের বক্তব্য শুনে একটি কথাতেই তার জবাব দিলেন, after all we can't support them unconditionally. পণ্ডিতজীর বক্তব্যের শেষেই আকাশ বাতাস মুখরিত করে ধ্বনি উঠল: 'আপোস নয়, সংগ্রাম চাই', 'সংগ্রামের পথে এগিয়ে চল', 'Marching column nerver stops, No compromise, no halt.' পণ্ডিতজী আমাদের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছিলেন। তাঁর ঐ হাসির মধ্যে যেন ছিল একটা প্রশ্রয়ের ইঙ্গিত। ট্রেন ছেড়ে দিল গৌহাটীর পথে আমিনগাঁও এর দিকে।

বন্দীদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ

অবশেষে ঢাকা থেকে মিহির ভট্টাচার্য্যের চিঠি আসল। প্রথম

পাতায় ছিল সাধারণ কথাবার্তা। পূর্ব নির্দেশমত পরের পাতায় তুলো ভিজিয়ে লাগাতেই অদৃশ্য কালিতে লেখা ফুটে উঠল। জানতে পারলাম ইংরেজ সরকার হিজ্‌লী স্পেশাল জেল উঠিয়ে দিয়ে রাজ-বন্দীদের বিভিন্ন জেলে বদলী করেছে। ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে বদলী হয়ে এসেছেন ১০৫ জন বন্দী। এর মধ্যে ৯৫ জনই আর. এস. পি. আই. দলভুক্ত। নরেন দাস, মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, ত্রিদিব চৌধুরী, চারু রায় প্রভৃতি নেতৃবর্গও এর মধ্যে আছেন। উক্ত নেতারা ঢাকা শহরের দলীয় কর্মীদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়েছেন।

জার্মানীর সোভিয়েত আক্রমণ ও জাপানী যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে পার্টির মূল রণনীতি কি হবে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে নেতারা জেল থেকে একটি লেখা পাঠিয়েছেন। লেখাটি প্রেসে দেওয়া হয়েছে। ছাপা শেষ হলেই নির্মল সেনগুপ্ত সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে লালমণিরহাটে যাবেন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। তার জন্য যেন সেল্‌টার ঠিক রাখা হয়।

এই চিঠি পাওয়ার আট, দশ দিন পর একদিন খুব ভোরে রঘুবীর এসে জানালো ঢাকা থেকে দুজন ভদ্রলোক এসেছেন ওর বাড়ীতে। তাদের জয়নালদের মস্‌জিদের সঙ্গে একটি ঘরে বসিয়ে রাখা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে নির্মল সেন ও আর একজন যুবককে দেখতে পেলাম। নির্মলদার সঙ্গে ঢাকা থেকে চলে আসার পর এই প্রথম দেখা হলো। জয়নালের সঙ্গে কথা বলে ঠিক হলো যে ঐ মস্‌জিদের সঙ্গের ঘরটাতেই কয়েকদিন তাঁরা থাকবেন। নির্মলদারও ঐ জায়গাটি বেশ পছন্দ এবং নিরাপদ বলে মনে হলো। সঙ্গী যুবক রবি সূত্রধরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

নূতন ওয়ার থিসিস্‌

পরের দিন স্থানীয় কর্মীরা অন্য এক জায়গায় ওয়ার থিসিস্‌ নিয়ে

আলোচনায় বসল। ইংরাজীতে লেখাটি রবি সূত্রধর আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করলেন। জার্মানীর সোভিয়েত আক্রমণের পরও কেন পার্টি এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হিসাবেই মনে করে তার ব্যাখ্যা ছিল। সি. পি আই. কোথায় ভুল করেছে এবং তাদের ভুলের পটভূমি কী— তারই বিশ্লেষণ ছিল এই থিসিসে। মূল বক্তব্য ছিল আমাদের মতো পরাধীন দেশে প্রধান বিরোধ (**Principal contradiction**) বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামকে তীব্রতর করাই হল সোভিয়েতের সঙ্গে সহযোগিতার একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা। এক কথায় আর. এস. পি আই. সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য সেদিন দেখেনি। অ্যাংলো-আমেরিকান শক্তির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের ফ্যাসি-বিরোধী মহাজোট গঠন সত্বেও।

ইতিমধ্যে কয়েকদিন কেটে গেল, রংপুর যাওয়ার আগে নির্মলদা চাইলেন স্থানীয় নেতা নৃপেন নন্দীর সঙ্গে দেখা করে যেতে। নৃপেনবাবু তখন একটি ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখার ম্যানেজার। কলকাতা গেছেন অফিসের কাজে। দুদিন পর নৃপেনবাবু ফিরলে নির্মলদাসহ আমরা গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি সব শোনার পর বললেন যে একই সেল্টারে বেশীদিন থাকা ঠিক নয়। তিনি তাঁর অফিসের সঙ্গেই গেষ্টরুমে থাকার জন্য অনুরোধ করলেন। আরও বললেন, কলকাতা থেকে অফিসের লোক প্রায়ই ওখানে এসে থাকে। বাইরের লোক দেখে সন্দেহের কোন কারণই সেখানে হবে না। ঐ দিনই (১১ই মে ১৯৪২) রবি সূত্রধর ও নির্মলদাকে ঐ গেষ্টরুমে আনা হলো।

নেতার বিশ্বাসঘাতকতায় গ্রেপ্তার।

১৪ই মে ১৯৪২ সাল, ঠিক বেলা ১২-১৫ মিঃ এর সময় লালমণির-হাট ষ্টেশনের নির্দিষ্ট স্থানে এসে দাঁড়ালাম। একটু পরেই রবিকে

নিয়ে নির্মলদাও এসে পড়লেন। দেখতে পেলাম কয়েক হাজার বর্মা-প্রত্যাগত যাত্রীদের নিয়ে একটি ট্রেন প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে আছে। স্থানীয় রিলিফ কমিটি তাদের খাদ্য ও পানীয় দিয়ে যাচ্ছিলেন।

রংপুর যাবার ট্রেন ছিল ১২-২৬ মিনিটে। শুনলাম বর্মার যাত্রীদের জন্য গাড়ী ছাড়তে কিছু দেরী হবে। প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করেছি, এমন সময় শম্ভু সান্যাল নামে দলেরই এক ঘনিষ্ঠ সমর্থক আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। শম্ভু নির্মলদা ও রবি সূত্রধরকে চিনত না, আমার সঙ্গে কথা বলছিল। রবি বলল, ট্রেন ঠিক কটায় ছাড়বে জেনে আসতে। বেশী দেরী হলে আজ যাওয়া বাতিল করতে হবে। ট্রেন ছাড়ার সঠিক সময় জানবার জন্য ষ্টেশন মাষ্টারের অফিস থেকে ফিরে রেল লাইন পার হতে যাব সেই সময় একটা পেশীবহুল হাত আমার কলার চেপে ধরল। ঘটনা বুঝেই এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে দৌড় দিলাম। দুর্ভাগ্য সামনে পড়ে গেল একটা চলন্ত মালগাড়ি। এরই মধ্যে দুজন লোক আমার কোমর ও হাত ধরে ফেলেছে। ঠিক সেই সময় ধুতি ও গিলেকরা পাঞ্জাবী গায় একজন খাঁটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক হঠাৎ তার রিভলবারটি বুকে ঠেকিয়ে বলল, 'পালান হচ্ছিল absconder-দের নিয়ে? আর চেষ্টা : র কিছু হবে না।'

আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল অন্য প্ল্যাটফরমে। গিয়ে দেখতে পেলাম চারজন সাদা পোষাকের হিন্দুস্থানী পুলিশ রবি সূত্রধর ও নির্মলদাকে জাপটে ধরে আছে। শম্ভুকেও একজন রেলওয়ে পুলিশ কলার ধরে রেখেছে। স্থানীয় থানার দারোগাকেও দেখলাম দাঁড়িয়ে আছে। আমরা তিনজনেই গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম। স্পষ্ট বুঝলাম কোন বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে গোয়েন্দা পুলিশ আমাদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। থানার দারোগা আমাদের দেহতল্লাসীর জন্য এগিয়ে আসলে নির্মলদা প্রচণ্ড প্রতিবাদ করলেন। আইনানুযারী যে ব্যক্তি দেহতল্লাসী করবে তার দেহ প্রথমে তল্লাসী করতে দিতে

হবে। দারোগা সাহেব রাজী হচ্ছে না, নির্মলদা আমাদের ইঙ্গিত করেই প্ল্যাটফর্মের উপর শুয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও তাঁকে অনুসরণ করলাম। তিনজনই প্ল্যাটফর্মে গড়াগড়ি দিতে লাগলাম। নির্মলদাকে জোর করে ধরে তুলতেই খাঁটি ঢাকার ভাষায় দারোগাকে খিস্তি দিয়ে আবার মাটিতে শুয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও তাই করলাম। উদ্দেশ্য একটাই, যেভাবেই হোক রবির পকেটে ওয়ার থিসিস্ ও বিভিন্ন ঠিকানা লেখা ডাইরিটি পুলিশের অলক্ষ্যে সরিয়ে ফেলা। এইভাবে প্ল্যাটফর্মে গড়াতে গড়াতে গ্রেপ্তারের জায়গা থেকে বেশ খানিকটা দূরে রেললাইনের উপর দাঁড়ানো একটি গার্ডের কামরার সামনে এসে পড়লাম। আবার জোর করে দাঁড় করানোর পরই নির্মলদা তাঁর একটি পা দারোগার প্যাণ্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন। পুলিশ আমাদের দেহ তল্লাসী করবেই আমরাও কিছুতেই তল্লাসী করতে দেব না। এক ধরণের সত্যাগ্রহ শুরু হয়েছিল সেদিন লালমণিরহাট ষ্টেশনে।

ব্রহ্মদেশ-প্রত্যাগত যাত্রীদের ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার পর রিলিফ কর্মীসহ কয়েকশ লোক আমাদের চারদিকে জড় হল। এমন সময় স্থানীয় কমিউনিস্ট নেতা ডাঃ সূর্য্যকান্ত বিশ্বাস আমাদের সমর্থনে এগিয়ে এসে দারোগা ও কেন্দ্রীয় আই, বি, ইন্‌সপেক্টর হিমাংশু রায়ের কাছে আমাদের দাবীর ন্যায্যতা এবং এ ধরণের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। স্থানীয় জনতার মাঝ থেকেও প্রতিবাদের গুঞ্জন উঠল। এর পরই হিমাংশু রায়ের নির্দেশে পুলিশ আমাদের একটি হাত ছেড়ে দিল। মুহূর্ত দেরী না করে নির্মল সেন পকেট থেকে এক টুক্‌রো কাগজ মুখে পুরে দিলেন। হিন্দুস্থানী পুলিশ "খা লিয়া বাবু খা লিয়া" বলে চিৎকার শুরু করে দিলে, সমস্ত দৃষ্টিই গিয়ে পড়ল তাঁর দিকে। ঠিক তক্ষুনি রবি সূত্রধর কোন মতে বাঁ হাতে পকেট থেকে একটা খাম বের করে ওর পেছনে দাঁড়ানো গার্ডের কামরায় রেখে দিল। গাড়িতে উপস্থিত গার্ড সাহেব সঙ্গে সঙ্গে

খামটি তার কাঠের বাক্সে পুরে কুলির মাথায় চাপিয়ে বাড়ীর দিকে রওযানা হলেন।

গার্ড সাহেবের নাম জানি না। তার মুখচ্ছবিও আজ অস্পষ্ট। সেই দিন তার সহযোগিতার কথা আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

এরপর সবারই দেহ তল্লাসী করা হল। কিছু টাকা ছাড়া আর কোন কিছুই পাওয়া গেল না। তল্লাসীর পর আমাদের জি, আর, পি, অফিসে (Govt. Railway Police) এনে কিছুক্ষণের জন্য বসাল। ষ্টেশন থেকে টেলিফোনে জি, আর, পি, মারফত হিমাংশু রায রংপুরের আই, বি, ইনস্পেক্টর সত্য মুখার্জীকে খবর দিলেন ঐদিনই লালমণিরহাট থানায় চলে আসতে। সন্ধ্যার কিছু আগেই আমাদের স্থানীয় থানায় নিয়ে আসল। তখনও লক্আপে ঢোকায়নি। থানার অফিসে বসে আছি। ইনস্পেক্টর হিমাংশু রায় আমাদের উদ্দেশ্য করে বলতে শুরু করলেন যে definite information আপনাদের কাছে যুদ্ধবিরোধী অনেক ছাপানো কাগজপত্র এবং উত্তরবঙ্গের বহু ঠিকানা পাওয়া যাবে। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না কেন? যাই হোক, দেড় বছরের চেষ্টায় নির্মল সেনকে যে গ্রেপ্তার করা গেছে এটাও কম কথা নয়। কিছুক্ষণ পর একটি বিবৃতি নিয়ে শম্ভু সান্যালকে ছেড়ে দিল।

লক্আপে ঢুকিয়ে দেবার পর বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। সন্ধ্যার কিছু পর রংপুরের আই, বি, ইনস্পেক্টর সত্য মুখার্জী থানাতে এসে উপস্থিত হলেন। তাদের কথাবার্তা লক্আপে বসেই শুনতে পাচ্ছি। সত্যবাবু বলছেন যে জেলা আই, বি, অফিসে লালমণিরহাটে কোন Absconder আসার খবর ছিলনা। জি, আর, পি, মারফত টেলিফোন পেয়ে খুবই আশ্চর্য হই।

ইতিমধ্যে আমরা আলোচনা করছিলাম কার খবরে আমাদের গ্রেপ্তার করা হল। নির্মলদা, শম্ভুর কথা বলাতে জানালাম, ও জানতই না আপনারা এখানে এসেছেন। আমাদের বন্ধু হলেও কোন বৈঠকে

তাকে ডাকা হয়নি। ববি বলে উঠল. নৃপেন নন্দী নয়তো? আমরা দুজনেই চমকে উঠলাম। এটা এতক্ষণ চিন্তায় আসছিল না। কিন্তু আমাদের কাছে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। যে কোন কারণেই হোক একদা বিপ্লবী নৃপেন নন্দী ছিলেন কেন্দ্রীয় আই, বি, অফিসার হিমাংশু রায়েব সংবাদের উৎস (source). সহানুভূতি দেখিয়ে তিনদিন নিজ অফিসেব গেষ্টরুমে রেখে কলকাতায় খবর দেয়।

হিমাংশু রায় সাদা পোষাকের চারজন সেপাই ও একজন সাব ইনস্‌পেক্টরকে কলকাতা থেকে সঙ্গে এনেছিলেন। গ্রেপ্তারের সময় স্থানীয় দাবোগা ও রেলপুলিশের সাহায্য নেয়। শম্ভু সান্যালের সঙ্গে ষ্টেশনে দেখা হওয়া একটা হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। স্থানীয় পার্টি কর্মীরা এবপব নৃপেন নন্দীব সঙ্গে শম্ভুকেও সামাজিকভাবে বয়কট করে। বিবৃতি নিয়ে ওকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য হয়ত এই সন্দেহ হয়েছিল। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর শম্ভু এজন্য আমার কাছে খুব দুঃখ প্রকাশ করেছিল।

পরের দিন ১৫ই মে ১৯৪২ সেই বেলা ১২-২৬ মিনিটেব ট্রেনে বংপুব রওয়ানা হবার জন্য ষ্টেশনে নিয়ে আসল। ইতিমধ্যে প্রচুর ভীড় জমে গেছে। ষ্টেশনে ছোড়দা দেখা করতে এসে নির্মলদাকে বললেন, নৃপেন নন্দীই আমাদের গ্রেপ্তাবের জন্য দায়ী।

রংপুর এসে ট্রেন থামল। আমাদের সোজা নিয়ে আসল আই. বি অফিসে। এখানে এসে আমাকে গত রাত্রির মত আবার নানা জেরা করতে লাগল। গত রাত্রিতে প্রায় চার ঘণ্টা নানা প্রশ্ন করেও গোয়েন্দা অফিসারদের যেন আশ মিটছিল না। এক কথাই বার বার বলে যাচ্ছিল: যা জান বলে দাও, এক্ষুণি মুক্তি পেয়ে যাবে। আমারও এক জবাব ছিল: কিছুই জানি না। নির্মল সেন ও রবি সূত্রধরকে আমি চিনি না। অবশেষে প্রত্যেকের কাছ থেকে একটি মামুলী বিবৃতিতে সই করিয়ে সন্ধ্যার আগেই রংপুর জেলে পাঠিয়ে দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রুদ্ধকারার দিনগুলি

রংপুর জেলে

প্রথমে ভেবেছিলাম তিনজনে একসঙ্গে থাকব। কিন্তু ওদের দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছিল ফৌজদারী আইনের কয়েকটি ধারায়। আমাকে গ্রেপ্তার করেছিল ভারতরক্ষা আইন অনুযায়ী। নির্মলদা ও রবিকে নিয়ে গেল এক জায়গায়। আমাকে নিয়ে গেল ৬ নং ডিগ্রিতে। ছয় জন বন্দীর জন্য ছয়টি ছোট ছোট ঘর। ওদের কাছ থেকে আলাদা হওয়াতে খুবই বিষণ্ণ বোধ করলাম। ছয় নং ডিগ্রিতে ঢুকেই চমকে উঠি। দেখতে পেলাম হাফ প্যান্ট পড়া খালি গায়ে এক সুদর্শন যুবক বালতি থেকে জল ছড়িয়ে দিচ্ছে আর খানিকবাদেই চিৎকার করে উঠছে 'সব যাচ্ছেতাই'। বুঝলাম যুবকটি মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। ঐ যুবকটির পাশেই ঝাঁকড়া চুল, লম্বা দাড়ি কয়েদির পোষাক পরা এক বিশালদেহী লোক দাঁড়িয়ে আছে। সেপাই বাইরে গেলে নিজেই পরিচয় দিয়ে বলল: নীলফামারী মহকুমার কোন এক গ্রামে বাড়ী। ডাকাতি মামলায় পাঁচ বছরের জেল হয়ে গত দুমাস এই ডিগ্রিতে আছে। ভাবছি বেশ ভালই হল। একদিকে পাগল আর একদিকে ডাকাত নিয়ে কিছু দিন থাকতে হবে। একটু বাদে একটি কম্বল ও টিনের থালাতে ভাত ও তরকারী নিয়ে একজন কয়েদি এসে সেলে রেখে গেল। ৬টার ঘণ্টা বাজতেই সেলে ঢুকিয়ে দিয়ে তালাচাবি বন্ধ করে সেপাই চলে গেল। অল্প সময়ের মধ্যে নূতন সেপাই এসে তালাচাবি পরীক্ষা করে অন্য সেলে গেল ঐ একই উদ্দেশ্যে। কিছুক্ষণ পর ঐ বাঙালী সেপাইটি সেলের ধারে বসে প্রথমেই বলল, অনেকদিন

পর একজন স্বদেশীবাবুকে এখানে আনা হল। ওর সঙ্গে নানা কথা শুরু করে দিলাম। সেপাই আমাকে ভাত খাবার জন্য অনুরোধ করল। কিন্তু খাওয়ার কোন স্পৃহা ছিল না। হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি শুরু হলে সেপাই চলে গেল। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। খুব ভোরে "সরকার সেলাম" চিৎকার শুনে জেগে উঠি। জেলার সাহেব সেপাই পরিবেষ্টিত হয়ে রুটিন পরিদর্শনে বেরিয়েছেন। সেলের সামনে এসে অভিবাদন জানালে তার প্রত্যুত্তর দিলাম। ঠিক দশটার সময় কোর্টে নিয়ে যাবে—তৈরী হয়ে থাকার জন্য জানিয়ে গেল।

বেলা ১১টার মধ্যেই রংপুর কোর্টে হাজির করল। খবর পেয়ে প্রবীণ বিপ্লবী ও উকিল বাণী বাগচী মশাই এলেন কোন জামিনের প্রয়োজন আছে কিনা জানতে। কিন্তু ভারতরক্ষা আইনের ১২৯ ধারায় কোন জামিনের সুযোগ নেই। হাকিম একথা বলে দিয়ে আমাকে প্রথম শ্রেণীর রাজবন্দী হিসাবে গণ্য করাব আদেশ দিলেন।

বেলা তিনটার মধ্যে জেলে ফিবে আসলাম। প্রথম শ্রেণীর বন্দী। সেলে গদি, বালিশ, বিছানার চাদর, লোহার খাট এসে গেল। ঠিক ছয়টায় আবার সেলে তালা পড়ল। পরের দিন ভোরে আবার সেই চিৎকার 'সরকার সেলাম'।

তৃতীয় দিন জেল লাইব্রেরীর বই-এর স্লিপ দিতে প্রভাবতীদেবী সরস্বতীর "জাগৃহী" উপন্যাসটি পাঠিয়ে দিল। দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ কেটে গেল। সারাদিন ৬ নং ডিগ্রির ছোট্ট সীমানার মধ্যে থাকতে হতো। শুধু সকাল ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত একজন সেপাই-এর পাহাড়ায় সেলের বাইরে নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে বেড়াতে দিত।

সারাদিন বই আর খবরের কাগজ পড়ে দিন কাটে। কথা বলার কেউ নেই। শেষে সেই ডাকাত রহমত আলীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললাম। ক্রমে জানতে পারলাম সে ডাকাত মোটেই নয়। বাংলা দেশের একজন নিরীহ কৃষক। জমি নিয়ে গোলমাল বাঁধায় জমিদারের নায়েব মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়ায় পাঁচ বছরের জেল হয়। ঘরে তার

বিবি, তিনটি নাবালক সন্তান ও বৃদ্ধা মা রয়েছেন। তার অবর্তমানে ওদের যে কি অবস্থা তা কেবল আল্লাই জানেন। এইসব কথা বলে রহমত আলী প্রায়ই দুঃখ করত। আর বলত, বাবু কিভাবে পাঁচটা বছর কাটবে? ফিরে গিয়ে সবাইকে কি দেখতে পাব? তার এই নিদারুণ যন্ত্রণার কোন জবাব জানা ছিল না। ঐ সেল থেকে চলে আসার পর আর ওর সঙ্গে দেখা হয় নি। রহমত আলীর কথা ভাবলে বহু যুগ পরে আজও মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এই উপমহাদেশে রহমত আলীদের সমস্যার সমাধান কি আজও হয়েছে?

দেখতে দেখতে প্রায় দশদিন কেটে গেল। একদিন লক্‌আপে ঢোকার কিছু আগে যে কয়েদিটি খাবার দিয়ে যায় তার কাছে খবর পেলাম: অন্য কোন এক জেল থেকে অনেক রাজবন্দীকে কিছুক্ষণ আগেই এখানে আনা হয়েছে।

পরের দিন সকাল বেলায় ভগলু জমাদারের পাহারায় বেড়াতে বেড়াতে ফাঁসির মঞ্চের কাছে আসতেই দেখতে পেলাম কিছু দূরে একটি রেলিং-ঘেরা জায়গায় কয়েকজন বন্দী ঘোরাঘুরি করছেন। এর মধ্যে কাউকেই চিনি না। হঠাৎ দেখলাম ত্রিবেণী বর্দ্ধন আমার দিকে হাত নাড়ছেন। একটু পরেই দেখলাম শান্তি সিংহ রায় ও কমল রায়চৌধুরী কলকাতার দুই ছাত্রনেতা আমাকে হাত নেড়ে অভিবাদন জানাচ্ছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলার শুরুতেই ভগলু জমাদার চিৎকার করে প্রচণ্ড বাধা দিল। এর পর দূর থেকে ত্রিবেণীদা ইঙ্গিত করতে সেলে ফিরে এলাম। এই ঘটনার কয়েক দিন পরে আমাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আটক রাখা হোল এই মর্মে একটি টাইপ-করা কাগজে সই করিয়ে নবাগত রাজবন্দীদের ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দিল। বন্দীদের রাখা হয়েছিল দুটি বড় হলঘরে ভাগ করে। একটিতে থাকতেন অপেক্ষাকৃত বয়স্করা। আমার খাটটি পাতা হল ত্রিবেণীদার বিছানার পাশেই। তার পরেই ছিলেন কমল রায়চৌধুরী, ফণী মজুমদার, মেদিনী চৌধুরী, বুলু দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

আমাদের পাশের হলঘরটিতে ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহকর্মী জনাব আশরাফউদ্দিন চৌধুরী, কুমিল্লা লেবার হাউসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি প্রবীণ রাজবন্দীরা। অনুশীলন সমিতির উদ্যোগে গঠিত ঐ লেবার হাউস ত্রিশের দশকে কুমিল্লা শহরে প্রথম ইলেকট্রিক আলো সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল।

আশরাফউদ্দিন চৌধুরীকে সবাই 'চদ্রী সাহেব' বলে সম্বোধন করতেন। তিনি একটি ইজিচেয়ারে শুয়ে এক হাতে বই আর এক হাতে গড়গড়া নিয়ে দিনের অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দিতেন। প্রয়াত চৌধুরী সাহেব পঞ্চাশের দশকে কিছুদিনের জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের মন্ত্রি-সভার সদস্য ছিলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই রবি ও নির্মল সেন নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে (security prisoner) আমাদের মধ্যে এসে পড়লেন। দলের প্রবীণ কর্মীর বিশ্বাসঘাতকতা এবং নিজের অসাবধানতাকে আমাদের গ্রেপ্তারের জন্য দায়ী করে কয়েকদিন খুবই বিমর্ষতার মধ্যে কাটিয়ে দিলেন। এই সাময়িক বিমর্ষতা কেটে গেলেই তাঁর চরিত্রের স্বভাব-সুলভ সজীবতা আবার ফুটে উঠল। গল্প, আড্ডায়, হাসিতে আমাদের বন্দীজীবনকে মাতিয়ে তুললেন।

দাদারা কেন এবস্‌কণ্ড করে না

সকলের টিফিন ছিল পাঁউরুটি, মাখন, ডিম ও চা। টিফিনের বাক্স আসলে বন্দীদের যে-কোন একজন সবাইকে বিতরণ করতেন। একদিন নির্মলদা নিজেই ঐ টিফিন বিতরণ করতে এগিয়ে এলেন। আমরা সবাই একটি কম্বলের উপর গোল হয়ে বসে খেতে শুরু করেছি। এমন সময় নির্মলদা একখণ্ড রুটির দুই পিঠে মাখন লাগিযে ডিম সহযোগে মুখে দেবার আগে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, এতদিনে বুঝলাম দাদারা কেন এবস্‌কণ্ড না করে জেলে থাকতেই পছন্দ করেন। উচ্চ হাসিতে চায়ের আসর ফেটে পড়ল।

একটু জেরাছে ছরাজ

এরপর নির্মলদাকে সবাই মিলে আরও কিছু বলার জন্য অনুরোধ করাতে তিনি শুরু করলেন·····

১৯৩১ সালের শেষের দিকে ঢাকা শহরে বিপ্লবীদের গুলিতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডুর্নো ভীষণভাবে আহত হন। এর পরই ঢাকা শহর ও তার আশেপাশে পুলিশের নির্মম অত্যাচার আরম্ভ হয়ে গেল। পাড়ায় পাড়ায় খানা-তল্লাসী ও অসংখ্য ছাত্রযুবকদের গ্রেপ্তারের পর স্বীকারোক্তির জন্য তাদের উপর অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন চলতে থাকে। এমন সময়ে ঢাকার একটি চায়ের দোকানে কুট্টিদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে ঃ ছহরের অবস্থা খুবই খারাপ মিঁঞা। গাড়ী লইয়া যেইখানেই যাই খালি দেখি পুলিস আর পুলিস। অনেক ছদেশী পোলাগো দইরা লইয়া গিয়া পুলিস মাইরের চোটে অজ্ঞান কইরা ফালাইতে আছে। এরপর আর একজন বলল, 'হ আমিও এই ছব শুইন্যা আইলাম মিঁঞা। ও মিঁঞা, চায়ে আর একটু মলাই ও একটা লাটি বিস্কুট দেও। বিস্কুট দিয়ে চায়ের কাপ নাড়তে নাড়তে বলে উঠল, বাবুগো ছাইলারা ছরাজের লাইগা জানটা দিয়া দিবার লাগছে। আমি কই কি ইংরাজ ছরকার যদি একটু জেরাছে ছরাজ দিয়া দেয় তাইলেই হালার ছমস্ত গণ্ডগোল থাইমা যায়।

গল্প শেষে প্রচণ্ড হাসিতে মুখরিত হয়ে সেদিনের মতো আসর ভঙ্গ হল।

মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাস

সকালে অথবা দুপুরে আমাদের মাঝে মাঝে আলোচনা সভা বসত। একদিন লিয়নটিয়েভের 'পলিটিক্যাল ইকনমি' নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আলোচনা সভার মূল বক্তা এই কথা বলে শেষ করলেন ঃ মার্ক্সের দার্শনিক তত্ত্বের সঠিক উপলব্ধি না হলে তাঁর অর্থনৈতিক তত্ত্বকেও উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কারণ মার্ক্সের অর্থনৈতিক মতবাদ ও সিদ্ধান্তগুলি তাঁর দার্শনিক চিন্তার ফলমাত্র।

এই সময়ে কুমিল্লার মনমোহন ঘোষ একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। ১৯৩৮ সালের শেষের দিকে বাংলাদেশের বিপ্লবীদের বেশীর ভাগই জেল ও বন্দীশিবির থেকে মুক্তি লাভ করেন। এর মধ্যে একটা বড় অংশ জেল অথবা বন্দী শিবিরেই তাদের পুরানো পথ সম্পর্কে মোহমুক্ত হয়ে কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বন্দীশিবিরেই কমিউনিস্ট সংহতিতে যোগ দেন। কুমিল্লা শহরের কোন এক পরিবারে তু'ভাই বন্দীশিবির থেকে কমিউনিস্ট হয়ে প্রায় একই সঙ্গে মুক্তি পান। এর মধ্যে বড় ভাই বন্দী থাকার সময়ই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। মুক্তির কিছুদিন পরই তার স্বাস্থ্যের আরও অবনতি ঘটে। খবর পেয়ে বিভিন্ন দলের কর্মীরা তাঁকে দেখতে তাঁর বাড়ীতে সমবেত হন। তখন তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্ত। ছোট ভাইটি দাদার শিয়রের কাছে গিয়ে বলতে শুরু করলেন, কমিউনিজম্, কমিউনিজম্…। উপস্থিত সকলে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে ভাইটি বলেন, দাদাকে কমিউনিজমের নাম শুনিয়ে দিচ্ছি যাতে পরজন্মে কমিউনিস্ট হয়ে জন্ম গ্রহণ করতে পারেন। ঘটনাটি শুনে আমরা যুগপৎ বিস্ময় ও কৌতুক অনুভব করলাম।

সমাজতন্ত্র ও আনোয়ার আলী

সেই সময় রংপুর জেলে মোট ২১ জন রাজবন্দীর মধ্যে একজন ছিলেন আর. সি. পি. আই-এর দলভুক্ত। দিনাজপুরের ক্ষেমেশ চ্যাটার্জী। তিনি ছিলেন একজন প্রবীণ বিপ্লবী ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি। আর. সি পি. আই তখন জাতীয় কংগ্রেস অথবা সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে লেফ্‌ট্ কনসোলিডেশন কমিটি থেকে সম-দূরত্ব বজায় রাখার নীতি গ্রহণ করেছিল। জাতীয় কংগ্রেসকে তারা ভারতের ধনিক শ্রেণীর দল মনে করত। ঐ দলের ধারণা ছিল একমাত্র আর. সি পি. আই-এর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার মধ্যেই রয়েছে ভারতীয় নিপীড়িত জনগণের মুক্তির একমাত্র পথ। পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত

ক্ষেমেশবাবু পরিস্থিতির বাস্তব মূল্যায়ন না করে মার্কস-লেনিনের পরিচিত সূত্রগুলি অনর্গল আওড়ে যেতেন। সব কথা ঠিক ধরতে পারতাম না। একদিন ক্ষেমেশবাবুর সঙ্গে তুমুল তর্কের পর একজন প্রবীণ বন্দী একটি ঘটনার কথা শুনালেন।

সুভাষচন্দ্রের একনিষ্ঠ ভক্ত ও ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মী জনাব আনোয়ার আলি মল্লিককে একদিন পুলিশ ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তারের পর সাধারণ চোর ও দাগী আসামীদের সঙ্গে কোমরে দড়ি বেঁধে কুমিল্লা ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নামায়। আনোয়ার আলী ষ্টেশনে নেমে শহরে তার পরিচিত বহু যুবক ও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে দেখতে পান। উপস্থিত যুবক ও ভদ্রলোকরা তাঁকে যেন দাগী আসামী বা সাধারণ চোর মনে না করে একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবেই মনে করেন এইজন্য পুলিশের গাড়ীতে ওঠার আগে উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে "বল ভাই সব বন্দেমাতরম্" বলে কয়েকবার ধ্বনি দেন। কিন্তু কেউ তাঁর উত্তরে সাড়া না দিলেও তিনি একাই ধ্বনি দিতে দিতে পুলিশের গাড়িতে উঠে পড়েন।

ঢাকা জেলে

১৯৪২-এর জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন সকালে বড় জমাদার জানিয়ে গেল মনমোহন ঘোষ, নির্মল রায়চৌধুরী ও নীরদ ভট্টাচার্যকে আজই বিকেলে অন্য কোন জেলে বদলী করা হবে। প্রত্যেকেই যেন তাদের বাক্স, বিছানা প্রভৃতি নিয়ে তৈরী থাকেন। প্রয়াত নীরদ ভট্টাচার্য ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য গণ-পরিষদের একজন নেতা এবং ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। বেলা তিনটার মধ্যেই আমাদের যাত্রার প্রস্তুতি শেষ হল। অন্য সব রাজবন্দীরা জেল গেট পর্যন্ত এসে বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন। বন্ধুদের অনেকেই চোখের জল চেপে রাখতে পারছিলেন না। বেদনাহত মন নিয়ে জেল আফসে এসে জানতে পারলাম:

আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। তিনজন সশস্ত্র পুলিশ সহ একজন গোয়েন্দা অফিসার আমাদের নিয়ে রওনা হল রংপুর ষ্টেশনের দিকে। ঘোড়ার গাড়ী শহরের মধ্যে পৌঁছতেই তিনজনে স্লোগান দিতে শুরু করলাম। উদ্দেশ্য কোন স্থানীয় কর্মী যদি শুনতে পেয়ে দেখা করতে আসেন। একটু পরেই দেখি একজন যুবক ঝড়ের বেগে সাইকেল চালিয়ে আমাদের গাড়ীর দিকে আসছে। গোয়েন্দার প্রবল আপত্তি সত্বেও আমাদের পরিচয় দিলাম। সেই যুবকটি ছিল আমার পরিচিত, ডাক নাম ফড়িং। কুমিল্লার ফণী মজুমদার কেমন আছেন এবং কোন জেলে বদলী হচ্ছি জেনে নিয়ে ফড়িং আবার প্রচণ্ড বেগে সাইকেল চালিয়ে চলে গেল।

পরের দিন বিকালে ঢাকা জেলের অফিসে পৌঁছলাম। অফিস থেকে আমাদের শকুন্তলা ওয়ার্ডে নিয়ে যেতে হুকুম দিল। ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছি হিজলী জেল থেকে আগত বন্দীদের রাখা হয়েছে ৫নং খাতায়। ঐখানে অনেক পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে থাকা হবে না বুঝতে পেরে একটু বিমর্ষ হয়ে গেলাম।

যা হোক ওয়ার্ডে ঢুকে দেখতে পেলাম বহু রাজবন্দী ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একদল রাজবন্দী পাশেই ভলিবল খেলছিলেন। আমাদের তিনজনকে দেখতে পেয়ে অনেকেই এগিয়ে এলেন। কেউ আমাদের পরিচিত ছিলেন না। এর মধ্যে হঠাৎ চিন্ময় বসু এগিয়ে এসে আমার হাত ধরলেন। একজন পরিচিত ব্যক্তি পেলাম।

তিনজনকেই নিয়ে যাওয়া হল "আমদানীর" এক নম্বর ঘরে। সেখানে ছিলেন শহীদ দীনেশ গুপ্তর ছোট ভাই নরেশ গুপ্ত, নারায়ণ চ্যাটার্জী (ফঃ ব্লক) এবং আর এস. পি. আই-এর রাধা গোবিন্দ বসাক প্রভৃতি রাজবন্দীরা।

শকুন্তলা ওয়ার্ড

এক বিশাল এলাকা জুড়ে "শকুন্তলা ওয়ার্ড"। এই সময় ৭০

জনের মত রাজবন্দী এখানে ছিলেন। এর মধ্যে একটা বড় অংশই ছিল চট্টগ্রামের। চট্টগ্রামের বন্দীরা দলমত নির্বিশেষে এ ওয়ার্ডের শেষ প্রান্তে একটি বিশাল হলঘরে থাকতেন। প্রধানত কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর এস. পি. আই দলভুক্ত সদস্যরাই তখন বন্দী ছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একজন মাত্র সদস্য বিখ্যাত কৃষক নেতা জিতেন ঘোষ তখনও জেলে। আর. এস. পি আই ও সি. এস পি-র একটি কিচেন এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্যদের জন্য ছিল আর একটি কিচেন অর্থাৎ বিভিন্ন দলের হাঁড়ি ভিন্ন। জিতেন ঘোষ ছিলেন ২ নং মিলিত কিচেনের সদস্য, জেলের মধ্যেও দলাদলির যেন শেষ ছিল না।

দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ কেটে গেল। ক্রমে অনেকের সাথে পরিচয় হল। এখানে ছিলেন ঢাকা জেলা ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক সুবোধ রায়, সমর গুহ (জনতা দলের প্রাক্তন সংসদ সদস্য) কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির নেতা পুলিন দে, ব্রজেন সেন, অমর চক্রবর্ত্তী (ফঃ ব্লকের প্রাক্তন সংসদ সদস্য)। ব্রজেন সেন ১৯৩৩ সালে সূর্য সেনের পাশে থেকে পুলিশের সঙ্গে গুলি বিনিময়ের পর গ্রেপ্তার হয়ে ৫ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

'শকুন্তলা ওয়ার্ড' এই কাব্যিক নামটা কেন হল জানার জন্য খুবই কৌতুহল হল। একজন রসিকতা করে বললেন, এ জায়গার রাজবন্দীরা হচ্ছেন এক একজন দুষ্মন্ত।

অধিকাংশই অপরিচিত এবং বয়সটা একটু কম থাকায় নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হত এই সময়। একদিন সন্ধ্যার সময় হেঁটে বেড়াচ্ছি বিশাল ওয়ার্ডের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। হঠাৎ চোখে পড়ল অসংখ্য শকুন উড়তে উড়তে ওয়ার্ডের শেষ প্রান্তে অবস্থিত বিশাল বটগাছটার উপর এসে বসতে শুরু করেছে। এক সঙ্গে এত শকুন আকাশে অনেক দিন দেখি নি। এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলাম—"সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে"।

এমন সময় একজন বললেন, কী দেখছেন ? আকাশের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখালে তিনি জানালেন, এত শকুন ওয়ার্ডের ঐ বটগাছটায় বাসা বেঁধেছে বলেই এ জায়গার নাম হচ্ছে 'শকুন্তলা ওয়ার্ড'। এত দিনে নামের রহস্য পরিষ্কার হল। যদিও নামটা বে-সরকারী ভাবে দেওয়া তবু ওটাই বহু বছর ধরে চলে আসছে।

৪২' এর আগষ্ট

১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বম্বে অধিবেশনে "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গৃহীত হয়। গান্ধীজী দেশের মানুষকে চরম আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানানো সত্বেও আন্দোলনের কোন কর্মসূচী গ্রহণ করলেন না। ভারতের বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে আপোষের শেষ চেষ্টা করে দেখতে চান। গান্ধীজীর এই পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়ে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট ৮ই আগষ্ট রাত্রিতে গান্ধীজী, মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সহ কংগ্রেসের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে আমেদাবাদ দুর্গে নিয়ে যায়।

গান্ধীজীসহ কংগ্রেসের নেতাদের গ্রেপ্তারের খবর ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। আসমুদ্র হিমাচল হয়ে উঠল উত্তাল। লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র জনতা 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' মন্ত্র বুকে নিয়ে ইন্দো-ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপস্থিতিকে উপেক্ষা করে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক মৃত্যুভয়হীন স্বাধীনতা সংগ্রামে। জনতার আক্রমণের লক্ষ্যস্থল থানা, পোষ্ট অফিস, আদালত প্রভৃতি নানা সরকারী দপ্তর। কেটে দিল হাজার হাজার টেলিগ্রাফের তার, আগুন লাগিয়ে দিল শত শত রেলষ্টেশনে, বিদ্যুৎগতিতে তুলে ফেলল হাজার হাজার মাইল রেলওয়ে লাইন।

ইংরেজ সরকারও প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল সংগ্রামী জনতার উপর। শত শত শহীদের রক্ত ঝরে পড়তে লাগল ভারতের নগরে প্রান্তরে। হাজার হাজার মানুষ অদৃশ্য হল কারাগারের অন্ধকারে।

স্থানে স্থানে বিমান থেকে গুলি বর্ষিত হল আন্দোলনকারী জনতার উপর। তবু অগণিত জনতা সমস্ত অত্যাচার ও মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে—ইংরেজ "ভারত ছাড়", "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" রণধ্বনিতে উপমহাদেশের আকাশ বাতাস মুখরিত করে দৃঢ় সংকল্পে এগিয়ে চলল স্থির লক্ষ্যের দিকে।

"ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে
কালোয় ঢেকেছে আলো জানে না কেউ
রাত্রি আছে কিনা আছে; দিগন্ত ফেণায় উঠে ঢেউ
তারি মাঝে ফুকারী কাণ্ডারী
নূতন সমুদ্র তীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি।"

এক অভূতপূর্ব বিরাট রূপ প্রচণ্ড তীব্রতা এবং ঐতিহাসিক সম্ভাবনা নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন বয়ে চলল '৪২ এর আগষ্টে ভারতের বুকে। আবাল্য স্বাধীনতা সংগ্রামের যে রূপের কল্পনা করেছিলাম আজ তা বাস্তবে রূপায়িত। দুর্ভাগ্য পথের মাঝে নেতৃত্বস্থানীয় সদস্যের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য গ্রেপ্তার হয়ে এই ঐতিহাসিক সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারছি না। খবরের কাগজের পাতায় আন্দোলনের সংবাদ পড়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল।

আগষ্টের মাঝামাঝি একদিন সকালে আমাদের কয়েকজনকে জেল কর্তৃপক্ষ জানালেন যে আগামীকাল কলকাতার কোন জেলে বদলী করা হবে। সবাই যেন প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু ঐ দিনই বিকালে তাঁরা আবার জানান যে বদলি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে।

ক্রমে জেলখানার পাঁচিল ভেদ করে কিছু কিছু সংবাদ আসতে লাগল। খবর আসল ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে ও ঢাকা-ময়মনসিংহের পথের রেললাইন আন্দোলনকারীরা বহু মাইল পর্যন্ত তুলে ফেলেছে। গেণ্ডারিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন সম্পূর্ণ ভস্মীভূত। শহর ও শহরতলীর বহু থানা, পোষ্ট অফিস, সরকারী দপ্তরগুলির উপর চলছে আন্দোলনকারী জনতার ক্রমাগত আক্রমণ। ঢাকা শহরের পথে পথে চলছে জনতার

সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর খণ্ডযুদ্ধ। একদিন খবর আসল এমনি এক খণ্ডযুদ্ধে পুলিশের গুলিতে তরুণ আর এস. পি. আই-এর কর্মী বিপুল বসাক সহ ১৭ জন আন্দোলনকারীর দেহ লুটিয়ে পড়েছে ঢাকার রাজপথে।

বিপুল বসাক ও বাচ্চু বসাকের উদ্যোগে গঠিত বনগ্রামের "তরুণ ব্যায়াম সমিতি"র সদস্যরা ঢাকা শহর ও শহরতলীতে আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এদের মধ্যে প্রয়াত ভগীরথ বসাক, প্রয়াত গোপীনাথ বসাক, প্রয়াত হরিগোপাল বসাক ও বিমল ঘোষাল অন্যতম। আগষ্ট আন্দোলনের ইতিহাসে তরুণ ব্যায়াম সমিতির অবদান চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সমিতির সদস্য বিমল ঘোষাল পরবর্ত্তী কালে ভারতীয় নৌবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৪৬ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে নৌবিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে এক গুরুত্বপূণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

অপরিচিতের নাম

কিছুদিনের মধ্যেই আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করে জেল ভরে তুলল। ধৃত বন্দীদের একটা অংশকে রাখা হয়েছিল 'শকুন্তলা ওয়ার্ডে।' এর মধ্যে ছিলেন শহীদ বিপুল বসাকের সহকর্মী সত্যেন বসাক (বাচ্চু), রমেশ চক্রবর্ত্তী, নন্দ বসাক, লোকনাথ বসাক প্রভৃতি ঢাকা শহরের আগষ্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠকরা। তাদের কাছে জানতে পারলাম কলকাতায় আগষ্ট আন্দোলনের সূচনা হয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের (১৮ মীর্জাপুর ষ্ট্রীট) উদ্যোগে। গান্ধীজী সহ নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ছাত্র ফেডারেশন স্কুলে কলেজে ধর্মঘটের ডাক দিয়ে বিশাল মিছিল বের করে এগিয়ে চলে ওয়েলিংটন স্কোয়ারেব দিকে। মিছিলের উপর চলে পুলিশের লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস। এর পর অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি এগিয়ে আসে এবং আন্দোলন স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে তার নিজস্ব গতিতে চলতে থাকে।

ঢাকা, কলকাতা, ২৪-পরগণা সহ পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে এবং বর্তমান উত্তরপ্রদেশের বালিয়া, বস্তি প্রভৃতি কয়েকটি জেলাতে আগষ্ট আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিল আর. এস. পি. আই এর ছাত্র ও যুবকর্মীরা। যদিও দলের প্রতিষ্ঠাতা নেতৃবৃন্দ ও অভিজ্ঞ কর্মীরা দু'বছর আগেই ভারত রক্ষা আইনে বন্দী। কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল না। দলের একমাত্র যোগাযোগের কেন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের অফিস (১৮ মীর্জাপুর ষ্ট্রীট) আগষ্ট মাস থেকেই ছিল পুলিশের হেফাজাতে। এতৎসত্ত্বেও বিভিন্ন জেলার ছাত্র ও যুব কর্মীরা তাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা ও সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক বিরাট ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করে যান। আন্দোলন সম্পর্কে ধৃত ব্যক্তিদের একটি তালিকা প্রায় প্রতিদিন সংবাদপত্রে বের হত। এই ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে আর. এস. পি আই-এর কর্মিদের নাম একটা বড় অংশ অধিকার করে থাকত।

এতদিন পর্যন্ত ঢাকা ও কলকাতা ছাড়া দল হিসাবে আর. এস. পি. আই-এর আর কোন নিজস্ব সত্তা ছিল না। কোথাও কংগ্রেস সোস্যালিস্ট, কোথাও ফরওয়ার্ড ব্লক আবার কোন কোন স্থানে অনুশীলন সমিতির সদস্য হিসাবে কর্মীরা পরিচিত ছিলেন। আগষ্ট আন্দোলন এবং যুদ্ধত্তোরকালের বিরাট গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমেই আর. এস. পি. আই-এর স্বতন্ত্র সত্তা বিকশিত হতে শুরু করে। সভ্য সমর্থকদের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করে সমাজের বিভিন্ন অংশে দলের প্রভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। অবিভক্ত বাংলাদেশে ও বর্তমান উত্তরপ্রদেশে এক প্রবল রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে দলের অভ্যুত্থান ঘটে এবং সেই সঙ্গে সমস্ত ভারতবর্ষেই রাজনৈতিক দল হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

এর সমস্ত কৃতিত্বটাই হল দলের ছাত্র ও তরুণ কর্মীদের।

"আনিলাম অপরিচিতের নাম ধরণীতে
পরিচিত জনতার সরণীতে।"

কমিউনিস্টদের বিরোধিতা

আগষ্ট আন্দোলনের সময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার সমস্ত শক্তি সংগঠিত করে এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবিরাম প্রচার চালিয়ে যেতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক মৃত্যুভয়হীন স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত সমস্ত দেশপ্রেমিক জনসাধারণকেই ফ্যাসিস্ট দালাল ও পঞ্চম বাহিনীর কার্যকলাপ হিসাবে চিহ্নিত করে। (দেশের ভিতর যারা নাৎসীদের গুপ্তচর হিসাবে কাজ করত তাদের বলা হতো "পঞ্চম বাহিনী")।

১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসের আগষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে ধৃত এবং বিনা বিচারে আটক ব্যক্তিদের নিয়ে প্রায় দু হাজারের মত রাজনৈতিক বন্দী ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আটক ছিলেন। 'শকুন্তলা ওয়ার্ডে' আগষ্টের প্রথম সপ্তাহে ছিলেন সত্তর জনের মত রাজবন্দী, অক্টোবর মাসে গিয়ে দাঁড়াল দুশো জনের উপর।

এক প্রচণ্ড বেগে শুরু হলেও নেতৃত্বহীন কর্মসূচী-বিহীন আন্দোলন অল্পদিনের মধ্যেই স্তিমিত হয়ে আসতে শুরু করল। জয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁর কয়েকজন সঙ্গীসহ হাজারিবাগ জেল থেকে পলায়নের পর পুনরায় আন্দোলনের কিছুটা গতি সঞ্চার হয়। কয়েক মাসের মধ্যেই জয়প্রকাশ, রামমনোহর লোহিয়া প্রভৃতি নেতারা গ্রেপ্তার হলে আন্দোলন ক্রমশঃ স্তিমিত হতে হতে এক সময় শেষ হয়ে যায়।

এর মধ্যে আর. এস পি. আই ছিল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তারপর ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট ও গান্ধীবাদীরা।

এক ধরণের যুক্তফ্রণ্ট

ঢাকা জেলে (শকুন্তলা ওয়ার্ডে) আর. এস. পি. আই-এর মধ্যে কয়েকটি উপদলের অস্তিত্ব দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম। দলের কোন অখণ্ড সত্তা ছিল না। চারু রায়, সুশীল ঘোষ, ফটিক বোসের গ্রুপ এবং বালক সমিতি—এই চারটি উপদলকে নিয়ে ছিল যেন

এক ধরণের 'যুক্ত ফ্রন্ট'। আমার কাছে প্রশ্ন ছিল অনুশীলন সমিতির অধিকাংশ সদস্যই যখন মোটামুটি ভাবে ঐক্যমত হয়েই আর এস. পি. আই গঠন করেছেন তবে দলের অভ্যন্তরে কেন উপদলের অস্তিত্ব রয়েছে। অনেককে জিজ্ঞাসা করে কোন সঠিক উত্তর পাইনি।

এর মধ্যে ফটিক বোসের গ্রুপের লোক হিসাবে যারা পরিচিত ছিলেন তাদের মধ্যে সুধাংশু রায় ও পরিমল রায় ছাড়া বেশীর ভাগেরই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণাও ছিল না। ফটিক বসু মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী নন একথা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন।

ইংরাজীতে আর এস. পি. আই.

ফটিক বোসের গ্রুপের লোক হিসাবে পরিচিত এবং ঢাকার কোন একজন বিশিষ্ট আর এস পি আই কর্মী। একদিন তাঁর কয়েকজন ক্যাডারের সঙ্গে আলোচনার সময় বলে যাচ্ছেন, বাংলায় 'অনুশীলন', পাঞ্জাবে 'গদর' ও ইউ, পি-তে 'হিন্দুস্থান রিপাবলিক আর্মি'—এই তিনটা লইয়া ইংরাজীতে আর. এস পি. আই.। যদিও আমার এই আলোচনা শোনার কথা নয়, তবু হঠাৎ কোন কারণে ঐ জায়গায় উপস্থিত হওয়ায় আর. এস. পি আই-এর উৎপত্তি সম্বন্ধে এই বিশ্লেষণ শুনে অতি কষ্টে হাসি চেপে দ্রুত চলে এলাম। চারু রায়, সুশীল ঘোষের গ্রুপের এবং বালক সমিতির সদস্যরা কিন্তু এ ধরণের কোন হাস্যকর ধারণা পোষণ করতেন না। তাঁরা সঠিক ভাবেই মনে করতেন একটা বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে অনুশীলন সমিতির প্রাক্তন সদস্যরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপর ভিত্তি করে আর এস. পি. আই. নামে এক নূতন দলের সৃষ্টি করেছেন।

বর্তমানে আর. এস. পি-র অন্যতম নেতা নিখিল দাস সুশীল ঘোষের গ্রুপের লোক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তার রাজনৈতিক জীবন শুরুই হয় শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ৪০'-এর দশকেই তিনি নারায়ণগঞ্জ সূতাকল শ্রমিকদের মধ্যে ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত নেতা।

চারু রায় গ্রুপের চিন্ময় বসু, অরুণ দাশগুপ্ত ও বালক সমিতির সত্যরঞ্জন বসু প্রভৃতিরা ছিলেন ঢাকা জেলা ছাত্র আন্দোলনের স্বীকৃত নেতা এবং আর. এস পি আই-র উৎপত্তি সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল খুবই স্বচ্ছ।

একদিন পার্টির মৌলিক মতাদর্শের উপর আলোচনা হচ্ছিল। (The fundamental strategic line of the Party) মূল বক্তা পার্টির গৃহীত নীতিকে বিশ্লেষণ করে বলে যাচ্ছেন যে আর. এস পি. আই হলো মার্কসবাদে বিশ্বাসী শ্রমিক শ্রেণীর দল। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিসমাপ্তির পথে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হওয়াই হচ্ছে পার্টির মূল লক্ষ্য।

আণ্ডার দি ব্রীজ অব গেণ্ডারিয়া

আলোচনা শেষে আমরা ঘরে এসে চায়ের আসরে বসে গেলাম। সেখানেই শচীদা (প্রয়াত শচী গোঁসাই) স্বগতোক্তির মত বলে যাচ্ছিলেন যে আমরা হচ্ছি শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়াই মূল লক্ষ্য। কিন্তু ঐ শ্রেণীকে কী ভাবে সংগঠিত করা হবে? এই পর্যন্ত বলেই একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন।

১৯৪০ সালে অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে ও সুভাষচন্দ্র বসুর উপস্থিতিতে ঢাকার করোনেশন পার্কে তিনদিনব্যাপী এক রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনটিকে শ্রমিক দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। সেইদিন সকালে কর্মকর্তাদের খেয়াল হল আজ শ্রমিক দিবসে যথেষ্ট সংখ্যক লোক কী ভাবে সমবেত করা যাবে? হিসাব করে দেখা গেল, ছোট ছোট ইউনিয়নগুলিকে একত্র করেও একশ'র বেশী শ্রমিক আনা সম্ভব হবে না।

এই দিনই সকালে একজন বিশিষ্ট প্রবীণ নেতা শচী গোঁসাই ও

নির্মল সেনকে ডেকে বললেন যেভাবেই হোক বেশ কিছু শ্রমিককে সম্মেলনে আনতেই হবে। এর পর দুজনে বের হয়ে গেলেন সাধনা ঔষধালয়, শক্তি ঔষধালয়, ঢাকা কটন মিল ও ছোট ছোট কয়েকটি হোসিয়ারী ফ্যাক্টরীতে। কিন্তু আগের থেকে কোন কিছু জানা না থাকার দরুণ অধিকাংশ শ্রমিকই মিছিলে যেতে রাজী হল না। ফেরার পথে শচী গোঁসাই-এর হঠাৎ চোখে পড়ল গেণ্ডারিয়া ব্রীজের নীচে খালের ধারে কয়েক শ মজুর মাটি কাটতে ব্যস্ত। এরপর তিনি নেমে খালধারে গিয়ে ঐ মজুর দলের সর্দারের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন যে তারা রোজ কত মজুরী পায়। উত্তরে সর্দার বলে, ছয় আনা। শচীদা বললেন, তোমাদের অন্তত আট আনা রোজ পাওয়া উচিৎ। সর্দার বলল, ঠিকই ত কইছেন বাবু ; কিন্তু করন যাইব কি ? শচীদা বললেন, আজ কলিকাতার অনেক বড় বড় নেতা সদরঘাটের করোনেশন পার্কে সভা করবেন। তোমরা মিছিল করে ঐ সভাতে গিয়ে আট আনা রোজের জন্য দাবী করলে ঠিকাদার বাধ্য হবে তা দিতে। অনেক বুঝিয়ে তাদের মিছিলে যেতে রাজি করিয়ে সর্দারের হাতে কয়েকটি টাকা দিলেন জল-খাবারের জন্য। বললেন, ঠিক তিনটার সময় যেন সবাই প্রস্তুত থাকে। এরপর উক্ত সময়ে কয়েকজন ভলান্‌টিয়ার লাল ঝাণ্ডা ও ফেষ্টুন প্রভৃতি নিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রায় তিন শ জনের মত জনমজুর মিছিল করে 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ', 'তুনিয়ার মজুর এক হও', 'আট আনা রোজ দিতে হবে' স্লোগান দিতে দিতে করোনেশন পার্কে প্রবেশ করলে মঞ্চে উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দসহ অগণিত দর্শক ঘন ঘন করতালি দিয়ে তাদের সম্বর্ধনা জানালেন।

শচীদার বলা শেষ হতেই তুমুল হাসিতে আমাদের চায়ের আসর মুখরিত হয়ে উঠল।

এর পর উক্ত আড্ডাতে একজন অপেক্ষাকৃত প্রবীণ রাজবন্দী আরও

একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। তাঁর বিশেষ পরিচিত একটি স্কুলের ছাত্র বি. ভি. দলের সঙ্গে ধীরে ধীরে সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। ঐ ছেলেটির এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রফ্রণ্টের কর্মী একদিন কথায় কথায় বলে, তোদের দলের নাম বি. ভি., বাংলাদেশের বাইরে এর কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু দেশের স্বাধীনতার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়েই সংগ্রাম করা দরকার। শুধু বাংলাদেশ দিয়ে কিছু হবে না। আমাদের দলের নাম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। সমস্ত দেশ জুড়ে এর সংগঠন। তোর উচিত আমাদের দলে যোগ দেওয়া। বন্ধুর কথা শুনে ছেলেটি কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে তার দলের নেতৃস্থানীয় একজন কর্মীর কাছে সেকথা জানালে, উত্তরে তিনি বলেন, সব বাজে কথা। আমরাও সর্বভারতীয় দল। ছেলেটিকে দুদিন পর রাত্রি নয়টার সময় রমনার কালীবাড়ীর সামনে উপস্থিত থাকতে বললেন। দুদিন পর ছেলেটি যথাসময়ে সেখানে অপেক্ষা করতে লাগল। প্রায় দশ মিনিট পর ছেলেটি দেখতে পেল যে সেই নেতা একজন পাঞ্জাবী শিখ ভদ্রলোকের সঙ্গে সাইকেল থেকে নামলেন এবং প্রায় পনের মিনিট ধরে গভীর আলোচনায় মগ্ন রইলেন। এরপর উক্ত পাঞ্জাবী ভদ্রলোক চলে গেলে ছেলেটিকে ডেকে নেতা বললেন, নিজের চোখেই ত দেখলে পাঞ্জাব থেকে আগত দলের একজন বিশিষ্ট সদস্যকে। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে আমরাও সর্বভারতীয় দল। কিছু দিন পর ছেলেটি যেভাবেই হোক সমস্ত ঘটনাটা সাজানো জানতে পেরে দল ছেড়ে ক্রমে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

এই আড্ডাতেই আরও একজন প্রবীণ কর্মী তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের একটি ঘটনা বলতে শুরু করলেন। তিনি তার ভাইকে তাঁর সঙ্গে মে দিবসের মিছিলে (১৯৪০) যোগ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েন উক্ত দিবসের মিছিল সংগঠিত করার কাজে। রাত্রিতে বাড়ি ফিরে তিনি ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন সে মিছিলে যায় নি। উত্তরে সে বলল যে তার বন্ধুদের সঙ্গে অন্য একটি

মিছিলে যোগ দিয়েছিল। উক্ত মিছিলটির উদ্যোক্তা ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। দাদা সেটা বুঝেই হাতের পাখাটা দিয়ে তাকে প্রচণ্ডভাবে পিটাতে শুরু করলেন। বৌদি এসে না থামালে হয়ত আরও বেশী মার খেত। এরপর থেকেই সে আর. এস. পি. আই-এর সক্রিয় কর্মী হয়ে ওঠে।

চল্লিশের দশকের এ সমস্ত কাহিনী লিখতে গিয়ে মনে পড়ছে নিকট অতীতের কয়েকটি ঘটনার কথা। ষাটের দশকের প্রথম দিকে সমস্ত বামপন্থী দলগুলি একত্র হয়ে এক কেন্দ্রীয় সমাবেশের ডাক দিয়েছেন মনুমেণ্ট ময়দানে—নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানাতে। সকাল থেকে গ্রামাঞ্চলের বহু স্ত্রী-পুরুষ-যুবক সমবেত হতে শুরু করেছে কলিকাতার বিভিন্ন পার্কে বিকালের মিছিলে যোগদানের উদ্দেশ্যে। এরকম একটা মিছিল সকাল থেকেই উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্কে এসে অপেক্ষা করছিল। সে সময় আমার মা বাড়ী ফেরার পথে পার্কে উক্ত মিছিলের এক বয়স্কা মহিলাকে জিজ্ঞাসা করেন এত লোক কোথা থেকে কেন এসেছে এবং কোথায় যাবে। উত্তরে মহিলাটি বলে তাদের বাড়ী বসিরহাট মহকুমার গ্রামাঞ্চলে। কেন এসেছে এবং কোথায় যাবে সে-ব্যাপারে একটু দূরে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে বলল যে ঐ বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেই সব কিছু জানতে পারবেন।

সত্তরের দশকে কোন একটি সর্বভারতীয় দলের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে ক্ষীয়মান হতে শুরু করল। দলের নেতাদের এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তাঁরা বলতেন, এটা কিছু না, বিহারে দল প্রচণ্ড গতিতে অগ্রসর হচ্ছে।

ঢাকা জেলে গুলি

১৯৪২ এর আগষ্ট আন্দোলন তখনও তীব্র গতিতে বয়ে চলেছে। একদিন সকাল প্রায় ৮টার সময় জেলের পাগলা ঘন্টি বেজে উঠল।

একটু পরেই শুনতে পেলাম গুলির অবিশ্রান্ত আওয়াজ। ৫নং খাতার রাজবন্দীদের উপর গুলি চলছে মনে করে আমরা শকুন্তলা ওয়ার্ডের বন্দীরা প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে শ্লোগান দিতে শুরু করি।

অল্প কিছুক্ষণ পরেই খবর এল রাজবন্দীদের উপর নয়, গুলি চলছে গুণ্ডা আইনে ধৃত বিনা বিচারে আটক বন্দীদের উপর।

এই বিনা বিচারে আটক বন্দীরা রাজবন্দীদের মতো কতকগুলি সুযোগ সুবিধার দাবীতে আমরণ অনশন শুরু করে। জেল সুপারিন-টেনডেণ্ট মিঃ নোবেল বন্দীদের দাবী সরাসরি অগ্রাহ্য করে শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর হন। এই বন্দীরা ছিল কলকাতার কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলের বাসিন্দা। জেলের আইন অনুযায়ী পাগলাঘণ্টি পড়লেই ওয়ার্ডের বন্দীরা যার যার ঘরে ঢুকে পড়ল। জেল সুপারের নির্দেশে বন্ধ ঘরে সেপাইরা ঢুকে গুলি চালাতে শুরু করলে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুপাখীর মতো অসংখ্য মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে লাগল।

আত্মরক্ষার তাগিদে কিছু বন্দী সেপাইদের দৃষ্টি এড়িয়ে গাছে উঠে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেপাইদের চোখে পড়া মাত্র তাদের উপরও চলল গুলি। পাখীর মত মানুষের মৃতদেহগুলি আছড়ে পড়তে লাগল ঢাকা জেলের পাঁচিলের গায়ে। পরে জানতে পারলাম একশত বন্দীর মৃত্যু হয় গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে। আহত হয় কয়েকশত।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জেল-গেটে মানুষের প্রচণ্ড ভীড় উপচে পড়ে। এই সময় ঢাকা শহরের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের কোন না কোন একজন সদস্য রাজবন্দী হিসাবে ঢাকা জেলে আটক ছিলেন। সবারই ধারণা রাজবন্দীদের উপরে গুলি চলেছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত খবরের কাগজগুলিতে কিন্তু এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের সংবাদ সামান্যই প্রকাশিত হল। বন্দীদের দাবী ছিল সামান্যও ন্যায়সঙ্গত।

জেলের চিঠি

আগস্ট আন্দোলনের সময় ধৃত রাজবন্দীদের ভীড়ে অবিভক্ত

বাংলার সমস্ত জেলগুলি কানায় কানায় ভরে ওঠে। বিভিন্ন জেল থেকে পরিচিত বন্ধুদের চিঠি আসতে শুরু হল। দীর্ঘ অদর্শনের পর বন্ধুদের চিঠিগুলি মনে এনে দিত এক অনির্বচনীয় আনন্দ। একদিন হঠাৎ ঢাকা জেলের ৫নং খাতা থেকে লেখা প্রবীণ বিপ্লবী পরেশ গুহর চিঠি পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম। দীর্ঘ দশ বছর পরেশদা জেলে বন্দী। আমার সঙ্গে তাঁর চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না। মণীষ সেনের কাছে পরিচয় পেয়ে লালমণিরহাটের ছেলে হিসাবে আমাকে চিঠি লেখেন। এরপর চিঠি আদান প্রদানের মাধ্যমে পরেশদার সঙ্গে গড়ে ওঠে এক গভীর সম্পর্ক।

একই জেলে কয়েক শ গজের মধ্যে থেকেও সেদিন ৫নং খাতার কোন রাজবন্দীর সাথে দেখা হওয়ার সুযোগ ছিল না। অসুস্থতার জন্য হাসপাতালে গেলে কারুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যেতো।

এমনিভাবে ঢাকা জেল হাসপাতালে আমার প্রথম দেখা হয় প্রয়াত ব্রজেন চক্রবর্তী ও বর্তমান আর. এস. পি-র অন্যতম নেতা সুখময় চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে।

মানসী ও আমি

একদিন বিকেল বেলায় কয়েকটি চিঠির সঙ্গে মানসীরও একটি চিঠি হাতে এসে পড়ল। যার জন্য এতদিন উন্মুখ হয়ে ছিলাম।

ডাঙ্গা, ১০ই অক্টোবর '৪২

নির্মলবাবু

প্রায় পনের দিন পর গতকাল বাড়ী আসতেই বীণা চিঠিখানা দিতে সরকারী ছাপ দেখে বুঝে নিলাম কার চিঠি। গতকাল যে সময় নৌকা ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে চলছিল বাড়ীর পথে, বার বার মনে হচ্ছিল আপনার কথা।

এখন দক্ষিণের ঘরে বসে লিখছি। জানালার দিকে তাকাতেই দেখা যায় বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত।

শরতের নির্মেঘ আকাশের কনকবশ্মি দিগন্তপ্রসারী সবুজ বরণ ধানের ক্ষেতের মাঝে রচে অদ্ভুত মোহময় মায়া। ঘন নীলিমার মাঝে রচে অশ্রুসিক্ত হেমন্তেব আগমন। প্রথম শীতের আমেজ ভরা। প্রভাতের ঝরে পড়া শেফালী ভুলে গিয়ে আনন্দেব অশ্রু বলে যায় বিদায়ের শেষ কথা।

বিস্ময়কর মানুষের জীবন। আগে আঁধাব পবেও আঁধার। শুধু মাঝখানে একটি পবিচ্ছেদ। অথচ কত আশা কত আকাঙ্খা, কত আনন্দ বেদনা নিয়ে ছুটে চলে এক দুর্জয়েব পানে।

লিখেছেন যে আমার চিঠি পেলে আপনাব খুবই আনন্দ হয়। কিন্তু আনন্দ দেবাব মত আমার মাঝে কিই বা আছে যা দিয়ে আপনাব কর্মহীন, বৈচিত্র্যহীন বন্দী জীবনের মুহূর্তের ক্লান্তিও দূব কবতে পাবি ? ·· (সেন্সরের কালির পোচ)

ডাঙ্গার কথা বোধহয় জেনেছেন। কিন্তু যা জেনেছেন তা আংশিক এবং অসত্য। · (সেন্সরের কালির পোচ) আজিকাব এই তরঙ্গেব বেগ কানন কান্তার, পল্লী, নগরী, মরু, গিরি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বিজয় বৈজয়ন্তী পতাকা উড়িয়ে। যে দেহ ঘিবে উঠেছিল একদিন কত আশা, কত বিচিত্র রঙীন স্বপ্ন ভেসে যায় সে নদীর জলে। কেউ খোঁজ রাখবেনা, জানবেনা কেউ, উঠবে না কোন খবরেব কাগজে। ভবিষ্যতে একটি হৃদয়ও হয়ত দেবে না একটি ব্যথাব নৈবেদ্য। তবু ··· যে ফুল না ফুটিতে ঝরিছে ধরণীতে / যে নদী মরুপথে হারাল ধারা জানি হে জানি / তাও হয়নি হারা।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবেন
ইতি—মানসী

পরের দিনই চিঠির উত্তর দিলাম

ঢাকা সেনট্রাল জেল
২৪শে অক্টোবর ১৯৪২

সুচরিতাসু

কাল বিকেলে আপনার চিঠি যে সময় পেলাম বসেছিলাম সাতাশ নম্বর ডিগ্রির প্রশস্ত বারান্দায়। দূরে জেলের উঁচু পাঁচিলের পেছনে অস্তগামী সূর্যের আলোকচ্ছটায় শরতের নির্মেঘ আকাশে নেমে আসছিল এক রক্তিম সন্ধ্যা। বার বার চিঠিখানা পড়লাম। আনন্দে আবেগে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল দেহ-মন। চিঠিখানা রয়েছে আমার হাতে।

"এই তোমারি পরশ রাগে চিত্ত হল রঞ্জিত"।

আমার এই বন্দী জীবনের নিঃসঙ্গতার মাঝে দাঁড়িয়ে কেবলই মনে হচ্ছে কবে কোন শুভক্ষণে আপনার সঙ্গে হয়েছিল আমার প্রথম পরিচয়। জানিনা এ পরিচয় স্বপ্ন না সত্য। এর উত্তর দেবে ভবিষ্যৎ। জীবনের প্রথম প্রভাতে যে আলোর সন্ধান পেয়েছি তার পেছনে ছুটে চলব উল্কার মত।

মানুষ মেতেছে আজ মরণখেলায়। এক বিষাক্ত বাতাস ঝঞ্ঝা বেগে বয়ে চলেছে সারা বিশ্বে। তাতে নিস্তরঙ্গ ভারত মহাসাগরেও লেগেছে ঢেউ-এর দোলা। আজকের এ হলাহল থেকে উঠে আসবে একদিন অমৃত। ঢংঢং শব্দে জেলের ঘণ্টা জানিয়ে দিল মধ্যরাত্রের ঘোষণা। একটু দূরের সেল থেকে কোন এক রাজবন্দীর উদাত্ত কণ্ঠ রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে ভেসে আসছে—

.. "আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন
ঊষা দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা"

আমার টেবিলের উপর সাজানো রয়েছে অনেক বই। কিন্তু কিছুতেই পড়তে মন বসছে না। মনে হচ্ছে আমি তো বইগুলি পড়ছি না—

বইগুলিই আমাকে পড়ছে। কেন এমন হচ্ছে জানেন কি ?

প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল।

ইতি—নির্মল

কিছুদিনের মধ্যেই মানসী চিঠির উত্তর দিল—"চিঠি লেখা আমার সার্থক যদি আপনার বন্দী জীবনে মুহূর্তের জন্যও তা আনন্দ দিতে পারে। নিজেই যখন বুঝতে পেরেছেন আপনি বইগুলি পড়তে পারছেন না, বইগুলিই আপনাকে পড়ছে এর কারণ আপনারই তো জানার কথা। আমাকে কেন বলতে হবে ?"

বারবার চিঠীখানা পড়লাম। সদ্য পড়া বুদ্ধদেব বসুর কবিতার দুটো ছত্র সারাদিন মনের মধ্যে অনুরণিত হতে লাগল।

"দিনের স্বপ্নে রাতের স্বপ্নে তোমার নামে শব্দ শুনি
লোকের চোখের অতীত স্বপ্নে তোমার নামে শব্দ বুনি।"

এরপর থেকেই মানসীর চিঠি আসা বন্ধ হোল। পরের চিঠির আর কোন উত্তর পেলাম না। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে কলকাতায চলে আসি। এখানে এসে একটি চিঠি দেই। এরও কোন উত্তর এল না। সেই সময় প্রচণ্ড বেগে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়াতে মানসীর কথা নির্জ্ঞান মনে চাপা পড়ে গেল।

গোয়েন্দার হস্তক্ষেপ

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার প্রায় দেড় বছরেরও কিছু পরে ঘটনাচক্রে মানসীব সঙ্গে আবার দেখা হয়। মনে হল আগের সেই উচ্ছলতা যেন কমে গেছে। একটু ম্লান হেসে আমাকে অভিবাদন জানালো। প্রথমে এড়িয়ে যেতেচাইলে—একটু চাপ দিতেই সমস্ত কথা খুলে বলতে আরম্ভ করল। ঢাকা জেলে যে সময় আমাদের চিঠি আদান-প্রদান চলছে—তখন একদিন গোয়েন্দা বিভাগের একজন অফিসার ওঁদের গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে আচমকা হাজির হয়ে ওকে প্রথমেই প্রশ্ন

করে ঢাকা জেলে যে রাজবন্দীর সঙ্গে চিঠির বিনিময় চলছে সেই রাজবন্দী যে দলের সদস্য, মানসীও সেই দলের সদস্যা কিনা? উত্তরে সে বলে, কোন দলেরই সদস্যা সে নয়। তবে সেই বন্দীর সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? জটিল প্রশ্ন সন্দেহ নেই। এরপর কয়েকঘণ্টা যাবৎ নানা ধরণের প্রশ্নে উত্ত্যক্ত করে এই বলে গোয়েন্দা অফিসার শাসিয়ে আসে যে ঢাকা জেলের রাজবন্দীর সঙ্গে চিঠি লেখা বন্ধ না করলে ভবিষ্যতে বিপদ হবে। এমন কি গৃহবন্দিনী করেও রাখা হতে পারে। কিছুদিন পরপরই খোঁজ নিয়ে যেত গোয়েন্দা অফিসার। গোয়েন্দা পুলিশের দ্বারা উত্ত্যক্ত হয়ে এবং বাড়ীর চাপের জন্যও সে চিঠি লেখা বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

সব শোনার পর মন থেকে যেন এক বিরাট পাষাণ ভার নেমে গেল। পরের দিনই কলকাতায় ফিরে আসি। আমাদের মধ্যে ঠিক হল ডাকে চিঠি না লিখে অন্য কোনভাবে যোগাযোগ রক্ষা করব।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে স্বাধীনতার দাবীতে আন্দোলন নব পর্যায়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে। শুরু হয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শেষ এবং তীব্রতর অধ্যায়। গতিবেগে চঞ্চল ভারতবর্ষ। এমনি সময়ে লোক মারফত মানসীর চিঠি পেলাম। সে চিঠিতে অনেক কথার মধ্যে ছিল আমাদের সম্পর্কের পরিণতি কী হবে তার একটা ইঙ্গিত। চিঠি পড়ার পর আমার মনকে ভাবিয়ে তুলল। পরিণতির কথা ভেবেই অগ্রসর হওয়া উচিত। ভেবে উত্তর দিতে হবে। কিন্তু সেই বিশেষ সময়ের রাজনীতির প্রবল ঘূর্ণাবর্ত ব্যক্তি জীবনের ভাবাবেগকে যেন কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল। আমার আর চিঠির উত্তর দেওয়া হয় নি।

"তুমি—চলে গেলে দূরে,—তবুও—
হৃদয়ের গভীর বিশ্বাসে আলো আসে ভোর হয়ে আসে"

ঢাকা জেলে হক সাহেব

ঢাকা জেলে বন্দী হত্যার বেশ কিছুদিন পর সে সময়ের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক স্বয়ং ঢাকা জেল পরিদর্শনে আসেন হত্যাকাণ্ডের তদন্তের উদ্দেশ্যে। জেলে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উক্ত হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কথা বলেন।

এক সময় তিনি শকুন্তলা ওয়ার্ডেও আসেন। রাজনৈতিক বন্দীদের তরফ থেকে প্রবীণ বিপ্লবী খুলনার গোবিন্দ ব্যানার্জী হক্ সাহেবের কাছে বক্তব্য রাখবেন সিদ্ধান্ত হল বেলা প্রায় ১১টার সময় হক্ সাহেব সদলবলে শকুন্তলা ওযার্ডে এসে উপস্থিত হলেন। এই প্রথম খুব কাছ থেকে তাঁকে দেখার সুযোগ হল। তিনি সাতাশ নম্বর সেলের বারান্দায় বসলেন। গোবিন্দবাবু রাজবন্দীদের তরফ থেকে বক্তব্য চোস্ত ইংরেজীতে শুরু করার দুই মিনিটের মধ্যেই হক্ সাহেব বলে উঠলেন, 'বাংলায় তাড়াতাড়ি ভাল কইরা বুঝাইয়া কন্।'

হক্ সাহেবের বক্তৃতা

হক্ সাহেব চলে যাওয়ার পর তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প শুরু হল। ঐ সময়েই তিনি প্রায় কিংবদন্তীর নায়ক হয়ে উঠেছিলেন বাংলার কৃষক সমাজের কাছে। একজন রাজবন্দী হক্ সাহেবের জনসভায় বক্তৃতার একটি কাহিনী শোনালেন।

বরিশাল জেলার কোন এক গ্রামে জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে বাংলাদেশের কৃষকদের উপর জমিদারের অত্যাচারের করুণ কাহিনী বর্ণনা করার সময় হক্ সাহেব কাঁদতে কাঁদতে রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছতে শুরু করেন। সভায় উপস্থিত জনতাও তাদের লুঙ্গি তুলে চোখের জল মুছতে আরম্ভ করে। মঞ্চ থেকে হক্ সাহেব ঐ দৃশ্য দেখে শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'এইবার আপনারা বইস্যা বইস্যা চোখের পানী মুছেন।' এই গল্প শোনার পর তুমুল হর্ষধ্বনিতে সবাই ফেটে পড়লেন। এরপর আরও একজন রাজবন্দী হক্ সাহেব সম্বন্ধে আর একটি গল্প আমাদের শোনালেন।

১৯৩৭ সালে তৎকালীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর হক সাহেব গিয়েছিলেন নিজ গ্রাম চাখাড়ে (বরিশাল)।

একজন নিকট আত্মীয় এসে হক সাহেবকে তার ছেলের জন্য একটি চাকুরী দেওয়ার অনুরোধ জানালে হক্ সাহেব বলেন, 'হ, প্রধানমন্ত্রী যখন অইছি একটা চাকুরীত দিতেই অইব। তবে তোমার পোলা কি বি. এ. পাশ করছে?' আত্মীয়টি বলেন, 'না।' 'তবে কি ম্যাট্রিক পাশ?' 'না'। 'কোন হাতের কাজ জানে?' উত্তরে আত্মীয়টি বললেন তাও জানেনা। এরপর হক্ সাহেব বললেন, 'কিছুই যখন জানেনা তবে তোমার পোলারে মন্ত্রীত্ব দেওন ছাড়া আর কিছুই করণ যাইব না।' এই গল্প শোনার পর আবার সবাই প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়লেন।

বোকাইনগরী

হক্ সাহেবের কাহিনী শেষ হতেই আর একজন প্রবীণ রাজবন্দী ময়মনসিংহ জেলার অন্যতম কৃষকনেতা আবদুল হামিদ বোকাইনগরী সাহেবের বক্তৃতার একটি গল্প শোনান। বোকাই নগরী ময়মনসিংহ জেলার গ্রামাঞ্চলের মানুষের ভোটে এম. এল. এ নির্বাচিত হয়ে কলকাতায় চলে আসেন। বহুদিন পর্য্যন্ত নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচন আরম্ভ হওয়ার কিছুদিন আগে তাঁর বিরোধীপক্ষের লোকেরা ঐ কথা বলে প্রচার শুরু করে যে বোকাইনগরী সাহেব গ্রামের মানুষের সুখ-দুঃখের কোন খবর না রেখে কলকাতায় বসে শুধু নিজের এবং তাঁর দলের লোকের স্বার্থ গুছিয়ে নিচ্ছেন।

এই প্রচারের কথা জানতে পেরে বোকাইনগরী সাহেব নিজ গ্রামে ফিরে এক জনসভায় দীর্ঘ সময় ধরে অনুপস্থিতির কারণ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। বক্তৃতার শুরুতেই বলেন, 'আপনেরা জানেন কি— আমি কোনখানে গেছিলাম? মনে অয় জানেন না। বিলাত

গেছিলাম জাহাজে চইড়া। পাটের দাম যাতে কিছু বেশী বাড়ান যায় তার লাইগ্যা রাজার লগে কথা কইতে।' পাটের দরের কথা শোনার পরই উপস্থিত জনতা উৎসাহের সঙ্গে সাহেবকে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

তিনি বলতে থাকেন, 'জাহাজ থিকা লামনের লগে লগেই একটা চাইর ঘোড়ার গাড়ী আমারে লইয়া রাজার বাড়ীতে গেল। রাজামশাই দেইখ্যাই কইলো, আসেন, বোকাইনগরী সাহেব আসেন—বসেন। আমি ঐ মস্ত রাজবাড়ীর একটা বড় চেয়ারে বইলাম। বহনের পর রাজা কইল, কি খাইবেন কন। আমি কইলাম, খাওন পরে অইব—তার আগে পাটের দর যাতে কিছু বাড়ান্ যায় হেই কথা একটু কইয়া লই। রাজা কইল, আপনে যখন আইছেন একটা কিছু বন্দোবস্ত অইবই। অখন কন্ কি খাইবেন? কইলাম, বাংলা দ্যাশের চাষা আমি, ভাতই খামু। রাজা তখন রাণীরে ডাইকা কইলো, বোকাইনগরী সাহেব আইজ খাইবো তুমি দুই কোউটা চাউল বেশী লইও।'

এই অভূতপূর্ব বক্তৃতার কথা শোনার পর সবার অট্টহাস্যে স্থানটি মুখরিত হয়ে উঠল। "সেই ট্র্যাডিশন আজও চলছে।"

শহীদ অখিল দাস স্মরণে

১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ পুলিশের গুলিতে নিহত অখিল দাসের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য পার্টির তরফ থেকে ঢাকা জেলে (৮ই মার্চ ১৯৪৩) একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রামের প্রবীণ আর. এস. পি. আই নেতা কেশব বিশ্বাস সভাপতিত্ব করেন। এক মিনিট নীরবতা পালনের পর সভার কাজ শুরু হয়। একজন মাত্র বক্তা সেদিন বক্তব্য রেখেছিলেন। প্রথমে বক্তা কোন পরিস্থিতিতে অখিল দাস ও সোমেন চন্দ নিহত হন, তার বিস্তৃত বিবরণ দেন। এরপর বক্তা বলেন যে—

উদীয়মান সাহিত্যিক ও তরুণ কমিউনিস্ট সোমেন চন্দ্রের মৃত্যু

সত্যিই মর্মান্তিক এবং বেদনাদায়ক। ঠিক তেমনি মর্মান্তিক এবং বেদনাদায়ক হল প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী অখিল দাসের পুলিশের গুলিতে মৃত্যু। এই দুই জনের মৃত্যুর জন্য দায়ী হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির ভ্রান্ত রাজনীতি। একপেশে চিন্তাধারার জন্য ভিন্ন রাজনৈতিক মতের প্রতি সহনশীলতার অভাব। কমিউনিস্ট পার্টিকে একদিন ইতিহাসের কাছে জবাব দিতে হবে। ইতিহাস বড় নির্মম, সে কাউকে ক্ষমা করেনা। এরপর সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণ এবং ইন্‌কিলাব—জিন্দাবাদ, ইঙ্গ-মার্কিন, জাপান সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক ধ্বনির মধ্যে সভার পরিসমাপ্তি ঘটে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

জেলখানায় মাঝে মাঝে নাটক, গান এবং কবিতাব আসর বসত। নাটকের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন টিটু নাহা। এক সময় শচীন সেনগুপ্তের 'মাটির মায়া' ও তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষ' নাটক অভিনীত হয়। 'মাটির মায়া' নাটকে একজন শ্রমিক-কর্মীর ভূমিকায় কয়েকটি দৃশ্যে অভিনয় করি। 'দুই পুরুষ' নাটকে মাতাল সুশোভনের ভূমিকায় প্রয়াত বলাই রুদ্রের মেঘমল্লার রাগে বেহালার অপূর্ব সুরের মূর্চ্ছনা, দর্শকমণ্ডলীকে মোহিত করে তুলেছিল। নুটবিহারীর ভূমিকায় টিটু নাহা উদাত্ত কণ্ঠে স্বগতোক্তি করে যাচ্ছেন, "It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God." মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছেন অসংখ্য দর্শক।

রাজবন্দীদের মধ্যে কয়েকজন বেশ সুন্দর গান গাইতে পারতেন, 'মাটির মায়া' নাটকে নারায়ণ চ্যাটার্জীর সুরে ও জগন্নাথ কর্মকারের কণ্ঠে বাউল গান সবারই প্রশংসা অর্জন করেছিল। নরেশ গুপ্ত ও ময়মনসিংহের ডাঃ সুনীল বিশ্বাস অপূর্ব রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারতেন। গানের আসরে ডাঃ সুনীল বিশ্বাস যখন পরিবেশন করতেন—

"ক্ষমিতে পারিলাম না যে,
ক্ষম হে মম দীনতা,"
"যেদিন সকল মুকুল গেল ঝরে,
আমায় ডাকলে কেন অমন করে ?"

সে সময় ব্রজ সেনের মমবেদনা আমাদের মধ্যেও যেন সঞ্চারিত হয়ে উঠত। তাঁর সুবেলা কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীতের ভাব-সম্পদ ক্ষণিকের জন্যে হলেও যেন নিয়ে যেত কোন এক অজানা অমর্ত্য লোকে।

একদিন কবিতা পাঠের আসরে টিটু নাহা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন—
"ওগো মা রাজার তুলাল গেল চলি মোর ঘরের সমুখ পথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার স্বর্ণশিখর রথে।
ঘোমটা খসায়ে বাতায়ন থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি, মা, দেখে "

হঠাৎ টিটু নাহা বলে উঠলেন—
আমি শেরোয়াণী সাহেবের দাড়ি—
আমি তিন নম্বর চৌকার হাঁড়ি

শ্রোতাদের মধ্যে কে একজন বলে উঠলেন, রবীন্দ্রনাথ ছেড়ে হঠাৎ নজরুল কেন ? পেছন ফিরে দেখতে পেলাম দীর্ঘদেহী, বিশাল বপু ও একগাল কালো ঘন লম্বা দাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সুভাষচন্দ্রের একনিষ্ঠ ভক্ত চট্টগ্রামের লোক মানখান শেরোয়াণী।

প্রবল হাস্যরোলের মধ্যে সেদিনের আসর শেষ হল। এরকম নানা গুণীজনের সমাবেশে কর্মহীন বন্দীজীবনকে অনেকটা সহনীয় করে তুলেছিল।

প্রয়াত সুধীরকিশোর বসু

ঢাকা জেলে আমাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছিলেন সুধীরকিশোর বসু। তিনি ছিলেন অনুশীলন সমিতির অন্তর্ভুক্ত "বাণী সঙ্ঘ-" এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ত্রিশের দশকে দীর্ঘদিন হিজলী, দেউলী প্রভৃতি

বন্দী-শিবিরে তিনি দীর্ঘ দিন আটক ছিলেন। প্রবীণ নেতা সুধীর বসুকে '৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনের সময় খুবই অসুস্থ অবস্থায় গ্রেপ্তার করে ঢাকা জেলে 'শকুন্তলা ওয়ার্ডে' নিয়ে আসে। অসুস্থ সুধীরদার সদা-হাস্য মুখ, অমায়িক ব্যবহার, তরুণ কর্মীদের রাজনৈতিক চেতনার মান যাতে উন্নত হয় সেদিকে তাঁর গভীর আগ্রহ দেখে আমি খুবই অভিভূত হয়ে পড়ি। অসুস্থ সুধীরদাকে ইংরেজ সরকার কয়েক মাসের মধ্যে মুক্তি দেয়।

মুক্তির পর একটু সুস্থ হলে ঢাকা থেকে 'গতি' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রথম সংখ্যা থেকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এটি সমর্থ হয়। কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পরেই সুধীরদার মৃত্যু হয়। প্রয়াত সুধীরকিশোর বসু ১৯৩১ সালে হিজলী বন্দী নিবাসে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব কমিটির সম্পাদক ছিলেন ১৯৪২ সালে সুধীরদার আরও তিন ভাই গৌরাঙ্গকিশোর বসু, সুবোধ-কিশোর বসু ও গণেশকিশোর বসু সবাই ঢাকা জেলে আটক ছিলেন। সুধীরদাদের সমস্ত পরিবারটাই ছিল রাজনৈতিক।

প্রয়াত নেপাল চক্রবর্ত্তী

একদিন রাত্রের কথা আজও মনে পড়ে। লক্-আপের একটু পরেই বাচ্চু ও নন্দ এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করল যে নেপাল চক্রবর্ত্তীকে কিছু বলেছি কিনা। উত্তরে বললাম, আমার তো কিছু মনে পড়ছে না। জানতে পারলাম যে খাবার ঘরে আমি নেপাল চক্রবর্ত্তীর দিকে কয়েক-বার তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, নেপালদা কেমন আছেন? নেপালের ধারণা হয় যে তাকে পাগল মনে করেই নাকি এ প্রশ্ন করেছি। এজন্য খাওয়া শেষে যখন ফিরে আসছি সে সময় পেছন থেকে একটা ছোট্ট চাকু নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হতেই বাচ্চু ও নকু তাঁর হাত চেপে ধরে চাকুটি কেড়ে নেয়। সামান্য দেরী হলেই মারাত্মক ঘটনা ঘটে যেতে পারত। সব শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই নেপাল চক্রবর্তী ঐ একই কারণে ঢাকা শহরের প্রবীণ বিপ্লবী অসিত ঘোষকে রান্না ঘরের বঁটিদা নিয়ে আক্রমণ করলে উপস্থিত রাজবন্দীরা ধরে ফেলেন। এরপরই জেল কর্তৃপক্ষ ওঁকে অন্যত্র সরিয়ে দেয়।

নেপাল চক্রবর্তী ছিলেন গরীব নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। লেখাপড়া করার সুযোগ তার বেশী হয়নি। সে যুগে ঢাকা শহরে তথা পূব বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে যে জোয়ার বয়ে চলেছিল সেই আবর্তে পড়ে হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারের অধিকাংশ ছেলে কোন না কোন বিপ্লবী দলের সঙ্গে জড়িয়ে যেত। নেপাল চক্রবর্তীও সেভাবে আর এস পি. আই-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। ক্রমে একজন জঙ্গী কর্মী হিসাবে তার খ্যাতি লাভ হয়।

আগস্ট আন্দোলনের সময় ঢাকা ও শহরতলীতে পোস্ট অফিস পোড়ান, রেললাইন তুলে দেওয়া, রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে লড়াইতে নেপাল চক্রবর্তী অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে।

সেই সময় গোয়েন্দা অফিসার প্রশংকা বসু অত্যন্ত সুকৌশলে ঐ আন্দোলনের সংগঠকদের এবং বহু আত্মগোপনকারী কর্মীদের গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়। পার্টির নির্দেশে নেপাল চক্রবর্তী ঐ অফিসারকে হত্যার উদ্দেশ্যে তার বাড়ীতে এক শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ করে। ভাগ্যক্রমে বসু বেঁচে গেলেও তাঁর বাড়ীটি প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে যেভাবেই হউক নেপালকে খুঁজে বের করতে সমস্ত গোয়েন্দা বাহিনীকে নির্দেশ দেন। সরকারের তরফ থেকে গ্রেপ্তার করতে পারলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। একজন গোয়েন্দা কর্মচারী অনুসরণ করার সময় খুব ভোরে বুড়ীগঙ্গার তীরে নেপালের হাতে নিহত হয়।

ক্রমে আগস্ট আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়। অধিকাংশ কর্মী গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার জন্য দলের সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ে। আর একদিকে গোয়েন্দা বাহিনী হন্যে হয়ে নেপাল চক্রবর্তীকে খুঁজতে থাকে। আত্ম-

গোপন করা অবস্থায় অর্থ ও আশ্রয়ের অভাবে প্রায় দিনই অনাহারে থেকে বনে-জঙ্গলে রাত্রি কাটাতে হত। সেই সময় দুর্ভিক্ষের পদধ্বনিও শুরু হয়েছে। তার পরিবারের সকলের অনাহারের খবরও তাকে খুব বিচলিত করে তুলল। এই পরিস্থিতিতে কোন এক পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে গোয়েন্দা অফিসার অম্বিকা বসু তাকে আত্মসমর্পণ করার প্রস্তাব দেয়। আত্মসমর্পণ করলে সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করে নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে আটক রাখা হবে।

এক দুর্বল মুহূর্তে নেপাল চক্রবর্তী আত্মসমর্পণ করলে তাকে নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে শকুন্তলা ওয়ার্ডে নিয়ে আসা হয়। এইভাবে আত্মসমর্পণের জন্য দলের মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জন উঠলে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ হতে হতে একদিন মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন।

দেশভাগের পর কলকাতায় তাঁর সঙ্গে দেখা হলে যে কোন একটি চাকরী খুঁজে দিতে অনুরোধ জানান। বেশ কয়েকবছর আগে কোন এক বাস্তুহারা কলোনীতে প্রচণ্ড দারিদ্রের মধ্যে তার জীবনের অবসান হয়। সেই যুগে তাঁর কাজের প্রচণ্ড সমালোচনা করলেও আজ মনে হচ্ছে নেপালদার কাছে অন্য কোন পথ খোলা ছিল কি ?

কারামুক্তি

১৯৪৩ সালের ১৭ই নভেম্বর। সকাল আটটায় চা খাওয়া শেষ হতেই আসগর আলী (একজন সাধারণ কয়েদী) এসে জানাল যে 'জমাদ্দার বাবু আপনের 'খালাসী' লইয়া (Release Order) আইতে আছে।' বলতে না বলতে জমাদার সাহেব মুক্তির আদেশ-পত্র দেখিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব ব্যক্তিগত জিনিষপত্র গুছিয়ে নিতে অনুরোধ করে। ঘরের সবাই আনন্দে হৈ-হৈ করে উঠলেন। বন্ধুরা বাক্স, বিছানা গুছাতে শুরু করলেন। বিভিন্ন ঘরে গিয়ে মুক্তির সংবাদ জানালে সবাই জড়িয়ে ধরে বিদায়-সম্ভাষণ জানালেন। এই সময়

কিছুক্ষণের মধ্যেই জিনিষপত্র সহ বন্ধুদের সঙ্গে এসে দাঁড়ালাম শকুন্তলা ওয়ার্ডের প্রধান ফটকের সামনে। ধীরে ধীরে গেট খুলছে। হেমন্তের প্রভাত শিশিরে সজল নয়নে বন্ধুরা আমাকে বিদায় জানালেন। প্রায় দু বছর পর ঢাকার রাজপথে এসে দাঁড়ালাম। ডেপুটি জেলার অমিয় সেনের নির্দেশে একজন সেপাই ঘোড়ার গাড়ী ডেকে আনলে উঠে বসলাম। অমিয়বাবু বিদায় নমস্কার জানিয়ে চলে গেলেন। পেছনে রেখে গেলাম হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনায় ভরা নানা রঙের রুদ্ধকাবার দিনগুলি। রেখে গেলাম অগণিত সুহৃদ্ ও আমার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে। গাড়ী এগিয়ে চলল টিকাটুলির দিকে।

হাটখোলা রোডের বাড়ীতে বড় পিসিমা ও বৌদিরা আমাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লেন। বিকালের দিকে ঠিকানা খুঁজে দলীয় কর্মী প্রীতীশ চন্দকে বের করে দেখা করার পর ওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে। পরিচয় হল ছাত্রনেতা কমল ভট্টাচার্য ও আরো কয়েকজনের সঙ্গে।

পরের দিন সকালে গেলাম গেণ্ডারিয়া ব্রীজের কাছে অসুস্থ সুধীরদাকে (সুধীর কিশোর বসু) দেখতে। ঐদিনই রাত্রি বারোটার গাড়ীতে রওয়ানা হলাম লালমনিরহাটের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে চলল একজন গোয়েন্দা। পরের দিন সকালে বাহাদুরাবাদ ষ্টিমার ঘাটে আরেকজন গোয়েন্দা কর্মচারীর হাতে সঁপে দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল। নূতন গোয়েন্দাটি আমার সঙ্গে গন্তব্যস্থান পর্যন্ত যাবে।

সন্ধ্যার কিছু পর লালমনিরহাট টিউমলপাড়ায় দিদির বাড়ীতে এসে পৌঁছাই। পরের দিনই খোঁজ খবর নেবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে জানতে পারি, দলের অধিকাংশ কর্মীর উপর '৪২-এর আন্দোলনের পর থেকে গতিবিধির নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী করা ছিল। গত মাস থেকে কিছু কিছু প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে। রঘুবীরের সঙ্গে দেখা করে গত দুই বছরের খবরাখবর নিলাম। ওর উপর থেকে নিয়ন্ত্রণাদেশ তখনও প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় নি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নব পর্যায়ের ছাত্র আন্দোলন

কয়েকদিন লালমনিরহাট থেকে কলকাতায় চলে আসি। আগস্ট আন্দোলনের সময়ে ধৃত বহু ছাত্রকর্মী ইতিমধ্যে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। একটু বয়স্ক কর্মীদের মধ্যে মুক্তি পেয়েছেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের (১৮ নং মির্জাপুর স্ট্রীট) প্রথম সাধারণ সম্পাদক অরুণ সেন ও বহরমপুরের গৌরী সেন। ছাত্র ফেডারেশনের অফিসটি আবার খোলা হয়েছে। অরুণ সেন ও গৌরী সেনের নেতৃত্বে ছাত্রকর্মীরা পুনর্গঠনের কাজ করে যাচ্ছিলেন। পরিচয় হলো ছাত্রনেতা রূপক গুহ, সৌরীন ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য এবং সদ্য কারামুক্ত সুষমা রায় ও নূতন কর্মী অহনা গুহর সঙ্গে। শ্রীমতী অহনা গুহ ছাত্রীদের সংগঠিত করার কাজে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছিলেন। ছাত্রনেতা জ্যোতি রায় এবং উত্তর কলকাতার আর. এস. পি. আই.-এর কর্মী বিজু সেন ও পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত প্রভৃতির সঙ্গে এই সময় পরিচিত হই। এই বিশেষ সময়ে রূপকের মা, আমাদের সবারই প্রিয় মাসিমা শ্রীমতী বেলাবাসিনী গুহ-র কাছে সমস্ত কাজেই অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেছি।

লক্ষ্য করলাম যে কলকাতায় স্কুল-কলেজের গণ্ডী ছাড়িয়ে পাড়ায় পাড়ায় যুবকদের মধ্যে ঢাকা শহরের মতোই পার্টির সংগঠন গড়ে উঠতে শুরু করেছে। মধ্য কলকাতার কানাই ধর লেন থেকে উত্তর কলকাতার রাজবল্লভ পাড়া পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ছিল। দক্ষিণ কলকাতায় 'কাল্‌চার ক্লাব' পুনরায় খোলার পর ঐ ক্লাবকে ভিত্তি করেই দক্ষিণ কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় সংগঠন গড়ে উঠতে শুরু

করেছে। ১৯৪৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্পেশাল পারমিশন নিয়ে রিপণ কলেজে ভর্তি হলাম। এই সময় কমিউনিস্ট পার্টির কমলাপতি রায়, সুকুমার গুপ্ত, কমল চ্যাটার্জী ঐ কলেজের ছাত্র ছিলেন। আর. এস. পি. আই-এর অজিত লাহিড়ী, জ্যোতিশ চৌধুরী, আর. সি. পি. আই-এর বিভূতি সেনগুপ্ত ও কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির রামরেণু মুখার্জী রিপণ কলেজে পড়তেন।

অস্থায়ী কমিটি

১৯৪৪ সালে জানুয়ারী মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের (১৮ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট) প্রথম সাধারণ সম্পাদক অরুণ সেন কর্মীদের এক সাধারণ সভা ডাকেন। উক্ত সভায় বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যকে সম্পাদক নির্বাচিত করে রূপক গুহ, সৌরীন ভট্টাচার্য, শচী মজুমদার, নির্মল রায় চৌধুরী ও অরুণ দত্ত প্রভৃতি কর্মীদের নিয়ে ছাত্র ফেডারশনের একটি অস্থায়ী প্রাদেশিক কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। এই সময় শুধু আর, এস.-পি. আই-এর ছাত্রকর্মীদের মধ্যেই এই কমিটি সীমাবদ্ধ ছিল। অহনা গুহকে কনভেনার নির্বাচিত করে গালর্স ষ্টুডেণ্টস সাব কমিটি পুনরায় গঠিত হয়।

ইউ এস এ

এই সময় কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট, ফঃ বঃ ও এড্ হক কংগ্রেস-পন্থী ছাত্ররা ইউনাইটেড ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন তৈরী করে ছাত্রদের ভিতরে কাজ করে যাচ্ছিল। অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর ছিলেন এই সংগঠনের সভাপতি। আর. সি. পি. আই দলভুক্ত ছাত্ররা অল বেঙ্গল ষ্টুডেণ্টস এসোসিয়েশন নামে আরেকটি ছাত্র সংগঠন তৈরী করেন।

মঞ্চে এলেন জ্যাকিদা

১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে ছাত্র ফেডারেশনের

প্রাদেশিক কার্যকরী সমিতির এক সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৮ নং মির্জাপুর স্ট্রীটে। সেই সময়ও নিষ্প্রদীপের ব্যবস্থা চালু থাকার দরুণ ইলেকট্রিক বাল্ব-এর উপর কালো শেড লাগান থাকাতে ঘরটিতে আধা আলো আধো ছায়া বিরাজ করছিল। এই সভার অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল রিলিফ ওয়ার্ক। সেই সময়ও পঞ্চাশের মন্বন্তরের জের চলছে। দুঃস্থ ছাত্রদের মধ্যে রিলিফ দেবার প্রস্তাব সভায় গৃহীত হলে প্রশ্ন উঠল, ঐ কাজ শুরু করার জন্য প্রাথমিক অর্থের যে প্রয়োজন হবে সেটা কিভাবে আসবে। এই সময় অরুণ সেন বারান্দায় অপেক্ষারত এক ভদ্রলোককে ডেকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আঁধো আঁধো আলোর জন্য ঐ ভদ্রলোকের মুখটা কিছুটা অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল। তাঁর গায়ে ছিল গলাবন্ধ কোট, চোখে চশমা, বেঁটে কিন্তু বেশ স্বাস্থ্যবান। নাম যতীন চক্রবর্তী, উপস্থিত বেশীর ভাগ সভ্যের সঙ্গেই তাঁর কোন পূর্ব পরিচয় ছিল না এবং ইতিপূর্বে তাঁর নামও কেউ শোনেনি।

এই ভদ্রলোকের পরিচয় দেবার সময় অরুণ সেন বলেন যে, যতীনবাবু '৪২-এর আন্দোলনে কিছুদিন বন্দী ছিলেন। ছাত্র ফেডারেশন রিলিফের কাজ শুরু করলে তিনি সহযোগিতা করতে পারেন। অরুণ সেন প্রস্তাব করেন যে যতীনবাবুর ঘনিষ্ঠ পরিচিত মাড়োয়াড়ী চেম্বার অব কর্মাসের সহ সভাপতিকে যদি ছাত্র ফেডারেশন রিলিফ কমিটির সভাপতি হিসাবে মনোনীত করে তাহলে ঐ ভদ্রলোক রিলিফের কাজের প্রাথমিক অর্থের দায়িত্বটা গ্রহণ করতে রাজি আছেন। এই প্রস্তাব সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কিছুদিনের মধ্যেই চেম্বার অব কমার্সের সেই ভদ্রলোকের সভাপতিত্বে হেদুয়ার কাছে "ষ্টুডেন্টস্ চিপ ক্যান্টিন"-এর উদ্বোধন হয়। কয়েক মাস সেখানে সুষ্ঠুভাবে কাজ চলেছিল। ক্রমে যতীন চক্রবর্তীর (জ্যাকিদা) সঙ্গে ছাত্রকর্মীদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ

হতে শুরু করল। ইতিমধ্যে অরুণ সেন পারিবারিক কারণে বাধ্য হয়ে একটি চাকরী গ্রহণ করেন। অফিসের কাজে প্রায়ই তাকে কলকাতার বাইরে যেতে হত। পার্টির কাজে মোটেই সময় দিতে পারছিলেন না। গৌরী সেনও কিছুদিন পর উড়িষ্যা থেকে ফেরার পথে আপত্তিকর ইস্তাহার রাখার অভিযোগে ট্রেনে গ্রেপ্তার হয়ে, এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে কটক জেলে বন্দী থাকেন।

এই সময় আমাদের একজন নেতার খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অরুণ সেন আমাদের পরামর্শ দিলেন জ্যাকিদার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করার জন্য।

ক্রমে অরুণ সেনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ক্ষীণ হতে হতে একটা সময় বিচ্ছিন্ন হযে গেল। আরেক দিকে জ্যাকিদার সঙ্গে কাজের মাধ্যমে সম্পর্ক গভীর হতে গভীরতর হয়ে উঠতে লাগল। অল্প সময়ের মধ্যেই জ্যাকিদা নিজ কৃতিত্বে পার্টি নেতা, শ্রমিক নেতা এবং স্বাধীনতোত্তর পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা হিসাবে আবির্ভূত হলেন।

১৯৪৪ সালে ১৩ই এপ্রিল বি পি এস এফ (১৮ নং মির্জাপুর স্ট্রীট) ও ইউ. এস. এর যৌথ উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লনে 'জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস' উপলক্ষ্যে ছাত্রদের এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ইউ. এস. এ. র তরফ থেকে সমর বসু, বি. পি এস. এফ-এর পক্ষ থেকে রমেন ভট্টাচার্য, অজিত লাহিড়ী, নির্মল রায়চৌধুরী প্রভৃতি ছাত্রকর্মীরা বক্তৃতা দেন।

ছাত্রনেতাদের সভা

১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসের শেষে প্রধানতঃ কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির ছাত্রনেতাদের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্রকর্মীদের এক সভা নাগপুরে অনুষ্ঠিত হয় উক্ত সভায় ইউ. এস এ-র পক্ষে থেকে ছাত্র

নেতা সমর বসু, দিলীপ বিশ্বাস (ব্রাহ্ম সমাজের বর্তমান আচার্য) বি.পি এস. এফ. এ-র পক্ষ থেকে অরুণ দত্ত, নির্মল রায়চৌধুরী যোগ দেন। অন্যান্য প্রদেশের ছাত্রনেতাদের মধ্যে বোম্বের প্রভাকর কুন্তে, পি এম. যোশী, দিনকার সাকরিকার, মাদ্রাজের রামমণি মেনন এবং রবীন্দ্র ভার্মা (জনতা সরকারের শ্রমমন্ত্রী ছিলেন) প্রমুখ ছাত্রনেতারা যোগ দিয়েছিলেন।

নাম পরিবর্তন

এই সভায় প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল এ. আই এস. এফ-এর পরিবর্তে অল ইণ্ডিয়া-ষ্টুডেন্টস কংগ্রেস (এ. আই. এস. সি) নাম গ্রহণ করা উপস্থিত কর্মীদের বক্তব্য ছিল যে এ. আই. এস. এফ নামটি বিভিন্ন প্রদেশে ছাত্রদের মধ্যে এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে কারণ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা পরিচালিত এ. আই. এস. এফ 'জনযুদ্ধ' নীতিকে সমর্থন এবং ৪২ এর আগষ্ট আন্দোলনে বিরোধিতা করার দরুণ এ. আই. এস. এফ নামটি বহু প্রদেশে ছাত্র সমাজের মধ্যে অপ্রিয় হয়ে ওঠে। অনেক জায়গায় ছাত্র ফেডারেশন বলতে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা পরিচালিত ছাত্রফেডাফেশনকেই মনে করা হয়। বি. পি. এস. এফ-এর পক্ষ থেকে উক্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করি। আমাদের বক্তব্য ছিল, বাংলা দেশে ছাত্রফেডারেশন নামটি খুবই জনপ্রিয়। ৪২ এর আগষ্ট আন্দোলনে ছাত্র ফেডারেশন (১৮ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট) এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করায় ছাত্রসমাজে তার ভাবমূর্তি খুবই উজ্জ্বল। দু'দিন আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হল যে আনুষ্ঠানিকভাবে অল ইণ্ডিয়া ষ্টুডেন্টস কংগ্রেস নাম গ্রহণের জন্য বোম্বেতে পরবর্তী সময়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশে ছাত্রফেডারেশন নামেই কাজ চলতে থাকবে।

আবার গ্রেপ্তার

নাগপুর ছাত্র সভা থেকে ফিরেই কয়েকদিন জ্বরে শয্যাগত হয়ে

পড়ি। একটু সুস্থ হওয়ার পর ১৯৪৪ সালের মে মাসের এক সন্ধ্যায় ছাত্র ফেডারেশন অফিস থেকে ফেরার সময় কলেজ স্ট্রীট ও কেশব সেন স্ট্রীটের মোড়ে তিন ব্যক্তি ঘিরে ফেলে আমহার্ষ্ট স্ট্রীট থানায় নিয়ে যায়। বুঝলাম আবার গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম। থানায় নিয়ে ঘণ্টা কয়েক বসিয়ে রাখার পর থানার দারোগা রাত্রি দশটার সময় আমাকে নিয়ে এল ঝামাপুকুর লেনের বাড়ীতে খানাতল্লাসীর উদ্দেশ্যে। প্রায় দেড ঘণ্টা তল্লাসী করার পর কিছুই না পেয়ে দারোগাবাবু একটু যেন হতাশ হলেন।

রাত্রি প্রায় বারটার সময় থানাতে ফিরিয়ে এনে লক-আপে ঢুকিয়ে দিল। পরের দিন রবিবার থাকার জন্য দুপুরের দিকে একজন ম্যাজিস্‌ট্রেটের বাডীতে এনে তার সামনে হাজির করার পর জানতে পারলাম যে ১৩ই এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের লনে ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে মিটিং করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ম্যাজিস্‌ট্রেট সাহেব এক সপ্তাহের জন্য লালবাজার থানার হেফাজতে থাকার আদেশ দিলেন। সন্ধ্যার একটু আগে লালবাজার লক আপে গিয়ে দেখতে পেলাম ঐ দিনের মিটিং-এর অন্যতম বক্তা অজিত লাহিড়ী এবং সভাপতি শ্রীনাগরমলকে (বড়বাজার কংগ্রেস কমিটির সদস্য)।

পরের দিন দুপুরের দিকে পুলিশ ভ্যানে করে নিয়ে আসল ইলিসিয়াম রোডে স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে আমাদের নিয়ে বসান হল চারিদিকে উঁচু পাঁচিল ও নানা ধরণের গাছ-গাছরায় পূর্ণ ছায়াঘেরা ছোট একটি বাগানে। ভয়ঙ্কর ইলিসিয়াম রোডে ঐ জায়গাটি কিন্তু আমার ভাল লেগেছিল। ঘণ্টা দুই বসিয়ে রাখার পর বিবৃতি নেওয়ার জন্য একজন গোয়েন্দা অফিসার ডেকে পাঠালেন। মামুলি বিবৃতিতে সই করিয়ে বললেন যে আগামীকাল থেকে আমাদের এখানে আর আনা হবে না। সাতদিন পর লাল-বাজার থানা থেকে কোর্টে হাজির করাবে। সেই সময় অফিসারটিকে অনুরোধ করলাম যে আপনাদের অফিসের ছোট্ট বাগানটা খুবই ভাল

লেগেছে আমাদের সাতদিনই দুপুরে এখানে নিয়ে আসুন। অফিসারটি অনুরোধ রক্ষা করে সপ্তাহের প্রত্যেক দিনই এখানে নিয়ে আসত লালবাজার থেকে। পরের দিন এসে ঐ বাগানে দেখতে পেলাম কয়েকজন কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পাটির আত্মগোপনকারী কর্মীকে গ্রেপ্তারের পর এখানে এনে বসিয়ে রেখেছে। ঐ কর্মীরা অধিকাংশই ছিলেন বিহার ও উত্তর প্রদেশের।

অনেক নূতন পরিচিত লোকের সঙ্গে ঐ ছায়াঘেরা জায়গায় বসে গল্প করতে করতে দিন কেটে যেতে লাগল। এক সপ্তাহ পর আমাদের ব্যাংকশাল কোর্টে হাজির করলে দেখতে পেলাম ১৩ই এপ্রিল তারিখের মিটিং-এর অন্যতম বক্তা ইউ. এস এর সম্পাদক সমরবাবুকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কোর্ট থেকে দশদিন পর মামলার তারিখ দিলে প্রেসিডেন্সি জেলে ৪৪ নং ডিগ্রিতে আমাদের এনে রাখল। ঐ ৪৪ নং ডিগ্রির ভয়ঙ্কর নির্জনতার কথা মনে হলে আজও শরীর শিউরে ওঠে।

আমাদের দুদিনের বেশী এখানে থাকতে হয়নি। ঐ জেলে বন্দী আমাদের দলীয় বন্ধুরা খবর পেয়ে জেল অফিসারের সঙ্গে কথা বলে চারজনকেই নিয়ে আসলেন ১০ নং সেলে। সেখানে ছিলেন রাজশাহীর প্রবীণ আর. এস. পি. আই নেতা অম্বিকা মৈত্র, ও ছাত্রনেতা শৈলেন ভট্টাচার্য। এর পাশেই লম্বা দোতলা বাড়ীতে কয়েকশ রাজবন্দী ছিলেন। একদিন সেখানে গেলে দেখা হল পুরানো বন্ধু গনেশ চ্যাটার্জি ও ঢাকার হরিদাস দাসের সঙ্গে। প্রবীণ বিপ্লবী অমূল্য ঘোষ ও প্রয়াত দেবব্রত রায়ের সঙ্গে এখানে প্রথম পরিচয় হয়।

মামলার তারিখে বেলা এগারটার মধ্যেই পুলিশ আমাদের ব্যাংকশাল কোর্টে হাজির করল। সেদিনই সাক্ষী ও দুপক্ষের উকিলের জেরার পর ম্যাজিস্ট্রেট মামলা স্থগিত রাখেন। তিন দিন পর আবার কোর্টে হাজির করলে ম্যাজিস্ট্রেট প্রত্যেকের ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন।

এরপর আমাদের প্রেসিডেন্সি জেলে ফিরিয়ে এনে সেই দিনই জেলখানার পেছনে হাঁটা পথে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে আসল। অফিসে এসে বসার পরই প্রচণ্ড জ্বর আসাতে আমাকে পাঠিয়ে দিল সরাসরি জেল হাসপাতালে। সেখানে ছিলেন দলীয় কর্মী অমলেন্দু গাঙ্গুলী। তাঁর কাছে খবর পেয়ে পরের দিনই শচীন ব্যানার্জী দেখতে এলেন।

কয়েকদিন জ্বরে শয্যাগত থেকে কিছুটা সুস্থ হয়েছি। এমন সময় একদিন শিবদাস ঘোষ ও নীহার মুখার্জি হাসপাতালে আমাকে দেখতে এলেন। শিবদাসবাবুর সঙ্গে পরিচয় অনেকদিন থেকেই ছিল। নীহার মুখার্জির সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় হল। কিছুক্ষণ পর নীহারবাবু চলে গেলেন। শিবদাস ঘোষের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা শুরু হল। এই দীর্ঘ আলোচনাতে জানতে পারলাম যে জেলের মধ্যে পার্টিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন নিয়ে তীব্র মতাদর্শগত সংঘাত হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। এই আটক নেতাদের অধিকাংশকেই বক্সা ও মেদিনীপুর জেলে বন্দী রাখা হয়েছিল।

আগষ্ট বিপ্লব বনাম আগষ্ট আন্দোলন

সে যুগে আর. এস. পি. আই-এর তাত্ত্বিক নেতা হিসাবে পরিচিত যামিনী পাল, রাখাল ঘোষ, বীরেন সরকার, সুশীল ঘোষ, চারু রায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ বক্সা জেলে ছিলেন (পরবর্তীকালে শ্রী সরকার ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে যোগ দেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি রাজশাহীতে খান-সেনাদের হাতে নিহত হন।)

বক্সা জেলে দলের হাতে-লেখা মুখপত্রে বীরেন সরকারের একটি প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। তিনি এই প্রবন্ধে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের মূল্যায়ণ করতে গিয়ে বলেন যে জাতীয় কংগ্রেসের বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত '৪২ এর আগষ্ট আন্দোলন

হচ্ছে এক সম্পূর্ণ বিপ্লব। বুর্জোয়াশ্রেণী এখন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণের পথে অগ্রসর হচ্ছে। এই আপোষের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকার অবসান ঘটতে চলেছে। সেই সঙ্গে পরিসমাপ্ত হতে চলেছে ভারতবর্ষের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরও। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেব যুগের সূচনা হচ্ছে। এই বক্তব্যকে সমর্থন করেন যামিনী পাল, সুশীল ঘোষ প্রভৃতি নেতারা।

এই বক্তব্যের বিপক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন বক্তব্য রাখেন রাখাল ঘোষ তার প্রবন্ধে। তিনি মন্তব্য করেন যে জাতীয় কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব ভারত ছাড় আন্দোলনের ডাক দিলেও ঐ আন্দোলন ছিল নেতৃত্বহীন ও কর্মসূচীহীন। ঐ আন্দোলন ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ—কোন বিপ্লব নয় কর্মসূচীহীন, নেতৃত্বহীন আন্দোলন অল্পকালের মধ্যে স্তিমিত হয়ে পড়ার জন্য এটা প্রমাণ হয় না যে বুর্জোয়া শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং আপোষ এই দ্বৈত চরিত্রের অবসান ঘটেছে।

ইতিহাসের অগ্রগতির পথে কোন একটি অনিবার্য্য অর্থনৈতিক স্তরকে অতিক্রম করে আর একটি স্তরে সরাসরি পৌছান যায় না। সুতরাং ভারতবর্ষে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের অবসান ঘটতে চলেছে এ ধারণা ভুল ও অনৈতিহাসিক। এ বক্তব্য সমর্থন করেন চারু রায়, প্রভাত ভাদুড়ী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

আগস্ট আন্দোলন কি শুধু এক আন্দোলন, না বিপ্লব এ নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল সে যুগের ভাষায় তা ছিল বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক রেভলিউশন বনাম ডেমোক্রটিক ডিক্টেটরশিপ আর দি প্রলেটারিয়েট অ্যাণ্ড পিজান্টস। সংক্ষেপে. বি ডি. আর ও ডি. ডি. পি. পি।

এক স্তরে দুই বিপ্লব

এই বিতর্কের অবসান হয় ত্রিদিব চৌধুরীর এক আপোস ফর্মুলায়। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, স্বাধীনতোত্তর ভারত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের

যুগে প্রবেশ করবে এটা ঠিক। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে অসমাপ্ত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি সমাপ্ত করার মধ্যে দিয়েই সেই বিপ্লবের স্তরে পৌছতে হবে। ত্রিদিব চৌধুরীর এই বক্তব্য পরবর্তী সময়ে উভয় পক্ষই মেনে নিয়েছিলেন।

এই সময় বিভিন্ন জেলে আটক দলীয় নেতাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে এক বিরাট মতপার্থক্য দেখা দেয়। নেতৃত্বের একটি বড় অংশই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন ভূমিকার সমালোচনা করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে এক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে স্টালিন কেবলমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদেশ-নীতির লেজুরবৃত্তি করার নির্দেশ দিয় পরাধীন দেশের মুক্তি আন্দোলন ও অন্যান্য দেশে সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে সহযোগিতা করার লেনিনীয় নীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আর বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের অবিসংবাদী নেতা হিসাবে মেনে নেওযার প্রশ্ন ওঠে না। দলীয় নেতৃত্বের আর একটি অংশের বক্তব্য ছিল যে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মূল নীতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। কমিন্টার্ণের সাধারণ নীতিকে (general line) সঠিক পথে রূপায়ণ নির্ভর করে কমিউনিস্ট পার্টি-গুলির নিজ নিজ দেশের জাতীয় পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ণের উপর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ না ঘটার দরুণ যান্ত্রিকভাবে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে মূল জাতীয় স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং অচেতনভাবে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরকেই শক্তিশালী করে তোলে।

শুধুমাত্র ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থানকে

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক অখণ্ড সত্তা হিসাবে দেখলে সেটা হবে একপেশে, অমার্ক্সীয় ও অনৈতিহাসিক।

১৯৪৪ সালের জুলাই মাসের শেষে দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করলে হাইকোর্টের আদেশে চারজনই মুক্তিলাভ করি।

সর্বদলীয় ছাত্র সংগঠন

১৯৪৪ সালের শেষের দিকে ইউনাইটেড্ ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশনের মধ্যে মতবিরোধের দরুণ অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করলে সহসভাপতি আতাউর রহমান সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সময় অরুণ সেন ও গৌরী সেন উদ্যোগ গ্রহণ করেন ইউ.এস.এ. ও বি. পি.এস. এফ (১৮নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট) একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানে মিলিত হয়ে যাবার জন্য। (ইউ. এস. এর অন্তর্ভুক্ত কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট ও ফরওয়ার্ড ব্লকের ছাত্রকর্মীরা প্রথমে বি. পি. এস. এফ. এর মধ্যে ছিলেন।) বেশ কিছুদিন আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে ইউ.এস. এর বিলুপ্ত ঘটিয়ে পুনরায় কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের ছাত্রকর্মীরা বি.পি.এস. এফ (১৮নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট)-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে যাবেন। আর. সি. পি. আই পরিচালিত অল বেঙ্গল ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশনের কাছে মিলিত হবার আবেদন জানালে তারাও ঐ আবেদনে সাড়া দিয়ে এ বি. এস এ-র অবলুপ্তি ঘটিয়ে বি পি. এস. এফ-এর সঙ্গে মিলিত হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সমস্ত দলের প্রতিনিধি নিয়ে একটি প্রাদেশিক কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়। এড হক কংগ্রেসপন্থী ছাত্ররা সমর বসুকে সম্পাদক করে নিখিল বঙ্গ ছাত্র কংগ্রেস নামে আর একটি নতুন ছাত্র সংগঠন তৈরী করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা বি. পি. এস.এফ্-এর কর্মকর্তা নির্বাচিত হলেন :

সভাপতি—আতাউর রহমান (সি এস পি)
সহ সভাপতি—ধীরেন ভৌমিক (ফঃ বঃ)
সহ সভাপতি—পুণ্যপ্রিয় দাশগুপ্ত (আর সি পি আই)

সাধারণ সম্পাদক—রূপক গুহ (আর এস পি আই)
যুগ্ম সম্পাদক—নৃপেন সান্যাল (ফঃ বঃ)
যুগ্ম সম্পাদক—নির্মল রায়চৌধুরী (আর এস পি আই)
অঃ সম্পাদক—বিজয়েশ রায় (আর সি পি আই)

এছাড়া বিভিন্ন দল থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি নিয়ে কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়। এর মধ্যে ছিল নিরঞ্জন সেনগুপ্ত (আর সি পি আই) সৌরীন ভট্টাচার্য (আর এস পি আই) প্রীতীশ চন্দ (আর এস পি আই) এবং আরও কয়েকজন। বলশেভিক লেনিনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি ছিলেন শ্রীমতী সুপ্রভা রায় তিনটি ছাত্র সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে একটি প্রতিষ্ঠানে মিলিত হবার ফলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে বাংলাদেশে আবির্ভূত হল।

এই ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রভাব ছাত্র সমাজের মধ্যে ক্রমেই পরিলক্ষিত হতে লাগল। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় ছাত্র ফেডারেশনের সংগঠন গড়ে উঠল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ছাত্র ফেডারেশনের প্রভাব ক্ষীয়মাণ হতে শুরু করে। কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচনে তারা পরাজিত হতে থাকে এবং তাদের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য বৃহত্তর ছাত্রসমাজ থেকে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শুধুমাত্র দলের সভ্য সমর্থক ছাত্রদের মধ্যে তাদের প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকে। এই সময় আর. এস. পি. আই-এর যে সমস্ত কর্মীরা বিভিন্ন কলেজে কলকাতার ছাত্রনেতা হিসাবে বেরিয়ে এসেছিলেন তার মধ্যে বর্তমান ডি. ভি. সি. ইউনিয়নের নেতা স্কটিশ চার্চ কলেজের সুনীল সেনগুপ্ত, বিদ্যাসাগর কলেজের কমল ঘোষ ও প্রদীপ রায়চৌধুরী অন্যতম।

১৯৪৪ সাল পর্যন্ত রিপন কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সম্পাদক ছিলেন সি পি আই-এর ছাত্রনেতা কমলাপতি রায়। কিন্তু কলেজ ইউনিয়নের পরবর্তী নির্বাচনে কমিউনিস্ট ছাত্ররা প্রত্যেকেই পরাজিত হয়। একদিন রিপন কলেজের ইউনিয়ন সংক্রান্ত একটি

সাধারণ সভাতে প্রভাবশালী ছাত্রনেতা কমলাপতি রায়কে অন্য দলের ছাত্রকর্মীরা জোর করে বক্তৃতামঞ্চ থেকে নামিয়ে দিলে দুই দল ছাত্রের মধ্যে প্রচণ্ড মারপিট শুরু হয়ে যায়। প্রিন্সিপালের হস্তক্ষেপে পরে শান্ত হয়। এই সময় থেকে বিভিন্ন কলেজে "জনযুদ্ধ" সাপ্তাহিক বিক্রি করার সময় কমিউনিস্ট ছাত্র কর্মীরা প্রচণ্ড বিক্ষোভের সম্মুখীণ হতে থাকে। এতদ্‌সত্ত্বেও কমিউনিস্ট ছাত্রকর্মীরা ভারতীয় জনগণের আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে সম্পর্কহীণ ভুল জনযুদ্ধে-র রাজনীতিকে প্রচারের জন্য যেভাবে দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে বিরোধিতার সম্মুখীণ হত সেটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল।

১৯৪৫ সালের প্রথম দিকে রূপকের উপর গতিবিধি নিয়ন্ত্রনাদেশ জারী হওয়াতে ওর ছাত্র ফেডারেশন অফিসে আসা বন্ধ হয়ে গেল। সেই স্থানে চিত্ত চৌধুরীকে আর.এস.পি.আই থেকে বি. পি. এস. এফের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হল। ইতিমধ্যে সাহিত্যিক সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে হুগলী জেলার ছাত্র কন্‌ভেনশন্ চুঁচূড়া শহরে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনভেনশনে চিত্ত চৌধুরী, নৃপেন সান্যাল, ধীরেন ভৌমিক ও নির্মল রায়চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্র কন্‌ভেনশন

১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির এক কন্‌ভেন্‌শন জলপাইগুড়ি শহরে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র চৌধুরী। উদ্বোধন করেন বি. পি. এস. এফ-এর সভাপতি আতাউর রহমান। এই কন্‌ভেন্‌শনেও চিত্ত চৌধুরী, সৌরীন ভট্টাচার্য্য, নৃপেন সান্যাল-এর সঙ্গে যোগ দিই। বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক বিধান সিংহ সেই সময় জলপাইগুড়ি জেলার অন্যতম ছাত্র-নেতা ছিলেন।

সম্মেলনের দু'দিন সভাপতি-সহ আমরা ছিলাম জলপাইগুড়ি জেলার বিখ্যাত চা ব্যবসায়ী তারিণী রায়ের বাড়ীতে। দুই দিন সেই

বাড়ীর রাজসিক আতিথেয়তার কথা আজও ভুলতে পারি নি। ঐ বাড়ীর একজন বললেন যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ জলপাইগুড়িতে তারিণী রায়ের বাড়ীতে অনেকবার আতিথ্য গ্রহণ করেছেন।

ঐতিহাসিক ছাত্র সম্মেলন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতির এক সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে ১৯৪৫ সালের ১লা জুন থেকে ৩রা জুন ময়মনসিংহ শহরে ছাত্র ফেডারেশনের তিন দিন ব্যাপী সারা বাংলা ছাত্র-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত ছাত্রফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দলগুলিই গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন এবং প্রচারে নেমে পড়েন। ময়মনসিংহ জেলার অন্যতম জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা মৌলানা আলতাফ হোসেনকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত করে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিতে ছিলেন শহরের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি—প্রবীণ বিপ্লবী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র, অমূল্য অধিকারী, সাংবাদিক দিব্যেন্দু ভৌমিক প্রভৃতি।

উক্ত সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির নেতা ইউসুফ মেহের আলি, অধ্যাপক ও সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী, হেমপ্রভা মজুমদার (প্রয়াত হেমপ্রভা মজুমদার ছিলেন চিত্র পরিচালক সুশীল মজুমদারের মাতা) ময়মনসিংহ থেকে নির্বাচিত এম. এল. এ. চারু রায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের এক যৌথ আবেদন কলকাতার বিভিন্ন দৈনিক কাগজগুলিতে প্রকাশিত হয়।

কলকাতাসহ বাংলাদেশের ছাত্র-ফেডারেশনের বিভিন্ন জেলা কমিটিগুলি গুরুত্ব সহকারে সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রচার চালিয়ে যেতে থাকে। ময়মনসিংহ সম্মেলন উপলক্ষ্যে সেই সময় বাংলাদেশে ছাত্রসমাজ ও রাজনৈতিক মহলে প্রচণ্ড উৎসাহ ও ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার ভূতপূর্ব

বন্দী বিপ্লবী ভূপেন সান্যাল। উদ্বোধক কিষাণ সভার সভাপতি স্বামী সহজানন্দ ও প্রধান অতিথি অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর। সম্মেলনের কয়েক সপ্তাহ আগে প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক চিত্ত চৌধুরীকে ইংরেজ সরকার এক আদেশ জারি করে কলকাতা থেকে বহিষ্কৃত করে এবং নিজ জেলা নোয়াখালী চলে যেতে বাধ্য করে।

সেই সময় পার্টি থেকে সম্মেলনের কাজ পরিচালনা করার জন্য অস্থায়ীভাবে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে মনোনীত হই।

ময়মনসিংহ যাত্রা

ইতিমধ্যে খবরের কাগজের মাধ্যমে সমস্ত জেলা কমিটিগুলিকে ময়মনসিংহ অভ্যর্থনা সমিতির অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানিয়ে রামকমল ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে দপ্তরসহ ১৪ই মে শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে সুরমা ভ্যালি এক্সপ্রেসে উঠে বসলাম। ট্রেনের প্রথম স্টপেজ ছিল রাণাঘাট. রাণাঘাট থেকে ট্রেন ছুটে চলেছে পোড়াদহের দিকে। এমন সময় ট্রেনের চেকার আমাদের টিকিট চেক করার পর কানের কাছে মুখ এনে বললেন, সাবধানে যাবেন, পেছনে গোয়েন্দা আছে। আমাদের সাবধান করার জন্য চেকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম বাড়ী থেকেই ওরা পেছনে লেগে আছে।

অল্প সময়ের মধ্যেই ট্রেন সারা ব্রীজ পার হয়ে ঈশ্বরদি এসে পড়লে নেমে গিয়ে সিরাজগঞ্জ-ঘাটের ট্রেনে চেপে বসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন এসে গেল সিরাজগঞ্জ-ঘাটে। এখান থেকে ষ্টিমারে জগন্নাথগঞ্জ-ঘাট। আবার ট্রেনে চেপে ময়মনসিংহ শহরে পৌছালাম রাত্রি নয়টার সময়। ষ্টেশনে আমাদের জন্য ছাত্র-নেতা পুলিন বিশ্বাস অপেক্ষা করছিলেন। পুলিন আমাদের নিয়ে গেল নির্দ্দিষ্ট স্থান সৌরভ প্রেসে।

পরের দিন সকালে অভ্যর্থনা সমিতির অফিসে গেলে স্থানীয় ছাত্রনেতা উৎপল ধর, প্রমোদ সিংহ রায় এবং স্থানীয় বিশিষ্ট কর্মী

গোপাল মৈত্রের সঙ্গে পরিচয় হল। সেখান থেকে সবাই মিলে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মৌলানা আলতাফ হোসেনের বাড়ীতে গেলাম। সেখানে অপেক্ষা করছিলেন প্রবীণ বিপ্লবী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র, অমূল্য অধিকারী ও দিব্যেন্দু ভৌমিক। সম্মেলন সম্বন্ধে তাঁদের সঙ্গে কিছু আলোচনা হল। ইতিমধ্যে পূববাংলার প্রচণ্ড বৃষ্টির হাত থেকে কিছুটা রক্ষা পাবার জন্য বিরাট বিরাট ত্রিপল দিয়ে সম্মেলন মণ্ডপ তৈরী শুরু হয়ে গেছে।

প্রতিদিন বিভিন্ন জেলা থেকে ডেলিগেট ও কর্মীদের বহু চিঠি আসতে লাগল সমিতির অফিসে। হিসাব করে দেখা গেল প্রায় দু'হাজার-এর মত ডেলিগেট ও দর্শক সম্মেলনে উপস্থিত হবেন। একদিন অভ্যর্থনা সমিতির অফিসে একজন কর্মী এসে জানালেন যে নারায়নগঞ্জ ঢাকেশ্বরী মিলের দু'শ শ্রমিক সহমর্মিতা জানাবার জন্য সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন। তাঁদের জন্য অভ্যর্থনা সমিতিকে থাকার জায়গা ঠিক করতে হবে।

একদিন ঢাকা থেকে বন্ধু কালীপ্রসাদ রায়ের একটি চিঠি নিয়ে ছাত্রকর্মী সনাতন রায় সম্মেলনের আগেই আমাকে একবার ঢাকা যাওয়ার অনুরোধ জানাল। আরও জানলাম যে ছাত্রনেতা কমল ভট্টাচার্য যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পটভূমিতে ছাত্র সম্মেলন হতে যাচ্ছে তার উপর একটি প্রতিবেদন তৈরী করেছে। ঐটি দেখে পছন্দ হলে প্রাদেশিক সম্পাদকের নামে ছাপান যাবে।

এর দুদিন পর ঢাকায় আসি। সেখানে কমল ভট্টাচার্য্য ও কালী প্রসাদের সঙ্গে লেখাটি নিয়ে দীর্ঘ সময় আলোচনা হয়। খুবই সুন্দর হয়েছিল লেখাটি। কিন্তু কলকাতার দলীয় কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা না করে এটি ছাপালে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে। অনেকেই আমাকে ঢাকার চারু রায়ের গ্রুপের লোক মনে করে। ঐ লেখাটি ছাপিয়ে প্রচার করলে এর বলিষ্ঠ দিকটি বিচার না করে উপদলের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করার এক প্রচেষ্টা হিসাবেই দেখবে।

আমার যুক্তি মেনে নিলেন সবাই। তবে ঐ প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই যে সম্পাদকীয় রিপোর্ট তৈরী করেছিলাম বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিরা তার প্রশংসা করেছিলেন।

সুনীল মুন্সীর প্রস্তাব

সম্মেলনের দুদিন আগে কলকাতার কমিউনিস্ট ছাত্রনেতা সুনীল মুন্সী অভ্যর্থনা সমিতির অফিসে এসে যুক্ত ছাত্র আন্দোলনের প্রস্তাব রাখেন সুনীল বাবুর বক্তব্য ছিল যে আমাদের সম্মতি থাকলে তিনি যৌথ ছাত্রআন্দোলন সম্পর্কে তার প্রস্তাব প্রকাশ্য সম্মেলনে পেশ করবেন। সুনীলবাবুর প্রস্তাবের জবাবে আমাদের বক্তব্য ছিল যে তাদের ছাত্র সংগঠন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির 'জনযুদ্ধ' নীতি গ্রহণ করে উক্ত পার্টিরই একটি শাখা হিসাবে কাজ করে আসছে। আমাদের সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দলের সদস্যরা "জনযুদ্ধ" নীতির ঘোর বিরোধী। তাদের সঙ্গে আমাদের মৌলিক পার্থক্য থাকার দরুণ ঐক্যবদ্ধভাবে কোন কর্মসূচী গ্রহণের প্রশ্ন অবান্তর। সুনীলবাবু মনঃক্ষুন্ন হয়ে চলে গেলেন।

প্রতিনিধিদের সংবর্ধনা

৩ শে মে ১৯৪৫। রাত্রি আটটার সময় সম্মেলনের মূল সভাপতি ভূপেন সান্যাল, উদ্বোধক স্বামী সহজানন্দ ও প্রধান অতিথি অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরকে নিয়ে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে এক হাজারের মত প্রতিনিধি ময়মনসিংহ স্টেশনে এসে পৌছালে অভ্যর্থনা সমিতির তরফ থেকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়। সভাপতি মৌলানা আলতাফ হোসেন উদ্বোধক, প্রধান অতিথি এবং সম্মেলনের সভাপতিকে মাল্যদানের পরই দীপ্তকণ্ঠে স্লোগান উঠল—ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ছাত্র-সম্মেলন জিন্দাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক। এর মধ্যে আর. সি. পি. আই-এর ছাত্রকর্মী কল্যাণ দাশগুপ্তের কণ্ঠে এক নূতন স্লোগান "বিপ্লবের নেতা কে—বিপ্লবী

মতবাদ' সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। ঐ দলের তরফ থেকে 'ক্লারিয়ন কল' নামে একটি ইংরেজী ইস্তাহার বিলি করা হয়। এই ইস্তাহারে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্বকে অস্বীকার করে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য জনগণের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল।

বিশাল বর্ণাঢ্য মিছিল

সম্মেলনের প্রথম দিন ১লা জুন (১৯৪৫) বেলা একটায় সভাপতি, উদ্বোধক ও প্রধান অতিথিকে নিয়ে অভ্যর্থনা সমিতির অফিস থেকে প্রায় দশ হাজার ছাত্র, যুবক ও স্থানীয় জনসাধারণের এক বিশাল ঝলমলে বর্ণাঢ্য মিছিল শুরু হয়।

মিছিলের প্রথমেই স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এগিয়ে চলেছে, কণ্ঠে তাদের গান "ভারত আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ"। এর পরই একটা খোলা গাড়ীতে ছিলেন সম্মেলনের সভাপতি, উদ্বোধক, প্রধান অতিথি এবং অভ্যার্থনা সমিতির সভাপতিসহ কয়েকজন স্থানীয় প্রবীণ বিপ্লবী নেতা। পেছনে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার হাজার হাজার প্রতিনিধি স্লোগানে স্লোগানে ছোট্ট জেলা শহরটাকে মুখরিত করে অগ্রসর হতে থাকে। বিরাট মিছিলের মধ্য থেকে ভেসে আসছিল—"বন্দে মাতরম্……সুজলাং সুফলাং" আবার কোথাও আন্তর্জাতিক সঙ্গীত 'জাগো অনশন বন্দী'…। মিছিল বড় রাস্তার মোড়ে আসতেই অপেক্ষারত নারায়ণগঞ্জের ঢাকেশ্বরী মিলের দুশো শ্রমিক কর্মচারী লালঝাণ্ডা হাতে 'ছাত্র মজুর হাত মেলাও" গাইতে গাইতে মূল মিছিলের সঙ্গে যোগ দিলে দীপ্তকণ্ঠে ধ্বনি উঠল—'ছাত্র মজুর কিষাণ এক হও'। এক ঘণ্টার মধ্যে মিছিল এসে পড়ল সম্মেলন মণ্ডপে। ভূপেন সান্যাল সভাপতির আসন গ্রহণ করার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তার অভিভাষণ পাঠ করেন। এর পর বক্তৃতা শুরু

করতে উঠলেন গেরুয়া বসনে আচ্ছাদিত মুণ্ডিতমস্তক, বিশালদেহী স্বামী সহজানন্দ। প্রায় দেড় ঘণ্টা ব্যাপী তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা হাজার হাজার মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগল। স্বামীজীর বক্তৃতার পর সেদিনের মত সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বিতর্কের ঝড়

পরের দিন সকালে ছাত্র প্রতিনিধিদের সম্মেলন ভূপেন সান্যালের সভাপতিত্বে শুরু হয় সম্পাদকীয় রিপোর্ট পেশ করলে সামান্য রদবদলের পর সেটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো। এর পরই সভাপতির অনুমতি নিয়ে চতুর্থ আন্তর্জাতিকের অনুগামী বলশেভিক লেনিনিস্ট পার্টির একজন ছাত্রপ্রতিনিধি একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস হচ্ছে ধনিক-শ্রেণীর একটি দল। যুদ্ধাবসানে তারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর এদেশে ধনিকরাজ কায়েম করতে বদ্ধপরিকর। এই সম্মেলন থেকে ছাত্রসমাজকে কংগ্রেসের ধনিক শ্রেণীর মেকি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মুখোশ খুলে দিয়ে তাদের প্রকৃত শ্রেণীচরিত্র জনগণের কাছে তুলে ধরার জন্য আহ্বান জানানো হোক। এই সম্মেলন আরও মনে করে যে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করার ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রস্তাবের সমর্থনে আর. সি. পি. আই-এর ছাত্রনেতা নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, বিশ্বনাথ মুখার্জি, খগেন শর্মা ও বলশেভিক লেনিনিস্ট পার্টির সুপ্রভা রায় বক্তৃতা করেন।

এই প্রস্তাবের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন আর. এস পি. এর ছাত্রনেতা সৌরীন ভট্টাচার্য, সুনীল চক্রবর্ত্তি ঢাকা জেলা ছাত্র-ফেডারেশনের সভাপতি সন্তোষ ভট্টাচার্য ও অস্থায়ী সম্পাদক নির্মল রায়চৌধুরী ফরিদপুর জেলার ছাত্রনেতা যতীন চ্যাটার্জি, ফরওয়ার্ড ব্লকের নৃপেন সান্যাল, বিনয় সেন, ধীরেন ভৌমিক, ছাত্রফেডারেশনের সভাপতি আতাউর রহমান ও বক্তব্য রাখেন।

প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তব্য ছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কোন এক বিশেষ শ্রেণীর দল নয়। ধনিকশ্রেণীর নেতৃত্বে থাকলেও মধ্যবিত্ত, কৃষক শ্রমিক তথা ভারতের মেহনতী মানুষ এই সংগঠনের মধ্যে রয়েছে। কংগ্রেস হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী একটি কেন্দ্রীয় মঞ্চ (Anti-Imperialist Central Component) এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যেমন আছেন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষকামী নেতৃত্বের একটা অংশ আবার সেই সঙ্গে রয়েছেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে বিশ্বাসী নেতৃবর্গ এবং স্বাধীনতাকামী অগণিত জনতা।

আমাদের সামনে বর্তমানে জাতীয় মুক্তি অর্জনের প্রশ্নটাই প্রথম এবং প্রধান শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঘোষণা বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কহীন নিছক কল্পনা মাত্র। দীর্ঘ তিন ঘণ্টা বিতর্কের পর মূল প্রস্তাবটি বিপুল ভোটে পরাজিত হলে বিরোধীদের বক্তব্য গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় দিন প্রকাশ্য সম্মেলন শুরু হয় প্রধান অতিথির ভাষণের মধ্য দিয়ে সভাপতি ভূপেন সান্যালের অভিভাষণের পর বক্তৃতা করেন আবদুল মালেক তার স্বভাবসুলভ বঙ্গজ ভাষায়। এর পর বক্তৃতা করেন নিখিল ভারত ছাত্র-কংগ্রেসের সভাপতি রামসুমের শুক্লা। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মুষলধারে বৃষ্টি হলে সভার কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

সম্মেলনের তৃতীয় ও শেষ দিন

সম্মেলনের তৃতীয় ও শেষ দিনটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিল "সভার মতে মিত্র শক্তির আসন্ন জয় পৃথিবীতে নবযুগের সূচনা করবে"। কিন্তু আগের দিন প্রচণ্ড বৃষ্টির দরুণ অসময়ে সভা শেষ হওয়ার জন্য বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা সম্ভব হল না। পরের দিন বিভিন্ন প্রস্তাবের উপর জলসাগুলিই প্রতিনিধিদের বক্তৃতার পরে সভা শেষ করে দিতে হয়।

সভার শেষ কর্মসূচী ছিল আগামী বৎসরের জন্য কর্মকর্তা ও কার্য্যকরী

সমিতির নির্বাচন। সভার শুরুতেই আর. সি. পি. আই তাদের জন্য কার্য্যকরী সমিতিতে নির্দ্ধারিত আসনের পরিবর্তে কয়েকটি বেশী আসন দাবী করেন। ঐ দাবী গ্রাহ্য না হলে আর. সি পি. আই. এর সদস্যরা ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ছাত্রনেতা ডাঃ খগেন শর্মার নেতৃত্বে সভাস্থল ত্যাগ করেন। আতাউর রহমানকে সভাপতি ও আর.এস.পি. আই, এর বিজন বিশ্বাসকে সম্পাদক এবং বিভিন্ন দল থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে নূতন কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়

গভীর রাত্রে সম্মেলন শেষ হলে ডেলিগেট ক্যাম্পে ফিরে না গিয়ে ঢাকার ছাত্রনেতা অরবিন্দ দাশগুপ্ত সহ কয়েকজন একত্র হয়ে ময়মনসিংহ ষ্টেশনের প্লাটফরমে চা, সিগারেট, সহযোগে পায়চারি করতে করতে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিয়ে পরের দিন একটু বেলার দিকে সৌরীন ভট্টাচার্য ও প্রীতীশ চন্দ সহ ঢাকার দিকে রওয়ানা হলাম। সেই যুগে ময়মনসিংহ সম্মেলন উপলক্ষ্যে অবিভক্ত বাংলাদেশে ছাত্রসমাজের মধ্যে যে অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনা ও কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল ছাত্র-আন্দোলনের ইতিহাসে তা উজ্জ্বল হয়ে আছে।

দক্ষিণা দা

সম্মেলন উপলক্ষ্যে ময়মনসিংহ শহরে অনেক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। অল্প কয়েকজন ছাড়া বেশীরভাগ মুখগুলি ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। এরই মাঝে দক্ষিণাদার (প্রয়াত প্রবীণ বিপ্লবী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র) কথা আজও মনে পড়ে। অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম সহ-সভাপতি দক্ষিণাদার বয়স তখন ষাট ছাড়িয়ে গেছে। এই বয়সে তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনা ও কর্মদক্ষতা যে কোন যুবককে হার মানিয়ে দিত। সম্মেলনের জন্য মণ্ডপ তৈরী, মাইক, প্রতিনিধিদের থাকা ও খাওয়ায় বন্দোবস্ত, সভাপতিকে নিয়ে মিছিল কোন্ কোন্ পথ দিয়ে যাবে প্রভৃতি যাবতীয় কাজ একাই যেন দক্ষিণাদা দায়িত্ব নিয়ে বসে আছেন। এমন কি প্রতিনিধিদের খাওয়ার মেনুও স্থির করছেন দক্ষিণাদা।

সম্মেলনের কয়েক দিন আগে কর্মীদের এক ঘরোয়া মিটিং-এ তিনি প্রস্তাব দেন যে বাংলাদেশের এতগুলি ছেলে আসবে এই শহরে। তাদের একদিন মাংস খাওয়াতেই হবে। অমূল্য অধিকারী ও কয়েকজন কর্মী টাকার কথা চিন্তা করে মৃদু আপত্তি জানালে তিনি অমূল্যদাকে ছাতা নিয়ে মারতে উঠলে—আমরা লজ্জিত হয়ে পড়ি। এর পর অমূল্যদা নিজেই একদিনের মাংসের দাম দিতে রাজী হলে খুশীতে ফেটে পড়েন।

সম্মেলনের সভাপতি 'চেইন স্মোকার' ভূপেন সান্যাল তাঁকে আসতে দেখলেই সিগারেট লুকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেন! সহজ সরল অথচ ময়মনসিংহ শহরের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি দক্ষিণাদার কর্মীদের প্রতি স্নেহের কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। দেশ ভাগের পর তিনি সপরিবারে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। প্রচণ্ড দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে ৯০ বছর বয়সে তাঁর জীবনের অবসান হয়।

দক্ষিণাদার মত মানুষগুলি ক্রমেই শেষ হয়ে আসছেন।

অমূল্য অধিকারী ঃ

ময়মনসিংহে বঙ্গীয় প্রদেশিক ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় অমূল্য অধিকারী ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখার ম্যানেজার ছিলেন। তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

বাংলা ভাষায় প্রথম যাঁরা মার্কসবাদের চর্চা শুরু করেছিলেন অমূল্য অধিকারী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। অমূল্যদার লেখা 'শ্রেণী সংগ্রাম', 'কমিউনিজম' প্রভৃতি বইগুলো পড়েই আমি এবং আমার ন্যায় অনেকেই চল্লিশের দশকে প্রথম মার্কসবাদের সাথে পরিচিত হই।

অমূল্যদা ১৯৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচনে অবিভক্ত বাংলাদেশে ময়মনসিংহ জেলা থেকে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হিসাবে এম. এল. এ নির্বাচিত হন। পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে কলকাতায় এক পথ দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

আজ মার্কসবাদের যথেষ্ট প্রচার ও প্রসার লাভ ঘটেছে। বাংলা-ভাষায়ও প্রচুর মার্কসবাদী পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু প্রথম যাঁরা বাংলাতে মার্কসবাদের উপর লিখতে শুরু করেছিলেন সেই রেবতী বর্মন, ধরণী গোস্বামী, অমূল্য অধিকারীরা ক্রমশই যেন বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যাচ্ছেন।

দুটি নামের তালিকা :

জুন মাসের শেষে (১৯৪৫) নবগঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কার্য্যকরী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আর. সি. পি. আই থেকে কার্যকরী কমিটির সভ্যদের কাছে দুটি নামের তালিকা পেশ করা হয়। একটি পেশ করে নিরঞ্জন সেনগুপ্ত আর একটি বিজয়েশ রায়। দুজনেই প্রকৃত আর. সি. পি. আই-এর প্রতিনিধি হিসাবে দাবী জানাল। এরপর কার্যকরী সমিতি থেকে দুজনের এক এনকোয়েরী কমিটির উপর ভার দেওয়া হয় আর. সি পি. আই-এর কারা প্রকৃত প্রতিনিধি স্থির করার জন্য কয়েক দিন পর নিরঞ্জন সেনগুপ্তের দেওয়া নামের তালিকাই আর. সি. পি. আই-এর প্রকৃত প্রতিনিধি হিসাবে গৃহীত হয়। এতে ছিল বিশ্বনাথ মুখার্জি, ডাঃ কালীদাস বোস, মনোরঞ্জন সাধুখাঁ ও শ্রীমতী বন্দনা দত্তর নাম।

অপপ্রচার :

ময়মনসিংহ বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনের উপর কমিউনিস্ট ছাত্র-নেতা সুনীল মুন্সীর একটি প্রতিবেদন উক্ত দলের এক সাপ্তাহিক মুখ-পত্রে প্রকাশিত হয়। ঐ প্রতিবেদনে তিনি বলেন যে ময়মনসিংহ বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের (১৮ নং মির্জাপুর স্ট্রীট) সম্মেলন প্রচণ্ড মতবিরোধ ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে শেষ হয়েছে। প্রতিনিধির সংখ্যা তেমন কিছু ছিল না ছাত্রদের অপূর্ণ স্থান পূর্ণ করতে "ঢাকেশ্বরী মিলের দুইশত ছাত্র প্রতিনিধি" উপস্থিত হয়েছিল।

এই প্রতিবেদনের বিরোধিতা করে কার্যকরী সমিতির পক্ষ থেকে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রস্তাবে বলা হয় যে সম্মেলনের অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য সুনীলবাবু খুবই আশাহত হয়েছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য ছাত্রদের মধ্যে শুধু মতবিরোধই দেখেছেন, দেখতে পাননি মতবিরোধিতা সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধভাবে আগামীদিনের আন্দোলনের জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে। কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মী হয়েও তিনি সম্মেলনকে সহমর্মিতা জানাবার জন্য শ্রমিক কর্মচারীদের উপহাস করেছেন।

তিনি দেখতে পাননি ছাত্র শ্রমিক তথা মেহনতী মানুষের ঐক্যবদ্ধভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের নব দিগন্তের উন্মোচনের সম্ভাবনাকে।

গতিবিধির নিয়ন্ত্রণ :

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ইংরেজ সরকার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রিট থানার এলাকার বাইরে আমাকে কোথাও না যাওয়ার জন্যে এক আদেশ জারি করে। ফলে ছাত্র ফেডারেশনের অফিস যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আমার বদলে মদন চ্যাটার্জ্জী যুগ্মসম্পাদক নিযুক্ত হয়। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরের শেষ ভাগে গতিবিধি নিয়ন্ত্রনাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

বন্দীমুক্তি শুরু

১৯৪৫ সালের ৬ই আগষ্ট জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহর দুটিতে এটম বোমা বর্ষণের পর আক্ষরিক অর্থেই মহাযুদ্ধের অবসান ঘটে।

এর পর থেকে বিভিন্ন জেলে বিনা-বিচারে আটক রাজবন্দীদের সরকার মুক্তি দিতে আরম্ভ করে। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই বেশীরভাগ বন্দী মুক্তি পান।

এই সময় আর.এস. পি.আই-এর নেতাদের মধ্যে মুক্তি পেয়েছিলেন সতীশ সরকার, সুশীল দেব, দ্বিজেন রায়, ননী ভট্টাচার্য, নীহার রায় (কুমিল্লা), রাখাল ঘোষ প্রভৃতি। আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত থাকার জন্য তখন অনেক মুক্ত বন্দী আমাদের বাড়ীতে আসতেন। এঁদের মধ্যে আমাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছিলেন ননী ভট্টাচার্য। এই সময় পরিচয় হয় সরোজ চক্রবর্ত্তী ও মুর্শিদাবাদ জেলার ছাত্রনেতা সন্দীপ শেঠিয়ার সঙ্গে।

সাংগঠনিক কমিটি

সদ্যমুক্ত নেতারা তাদের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে দলের প্রচণ্ড অগ্রগতি ও জনপ্রিয়তা দেখে আশ্চর্য্য ও মুগ্ধ হয়ে পড়লেন। কিছু দিনের মধ্যে সতীশ সরকার, সুশীল দেব প্রভৃতি মুক্ত নেতারা তাঁদের পছন্দমত লোক নিয়ে একটি অস্থায়ী প্রাদেশিক সংগঠনিক কমিটি তৈরী করেন। নেতাদের অনুপস্থিতে ছাত্র যুবকদের উদ্যোগে দলের যে অগ্রগতি হয়েছিল তাদের সঙ্গে কমিটি তৈরী করার আগে কোন আলোচনা করেছিলেন বলে জানি না। ছাত্র-যুবকর্মীরা তখন এই নিয়ে বিশেষ চিন্তা করেনি। তারা তখন নেতৃত্বের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আমাদের ধারণা ছিল দলের প্রচণ্ড জনপ্রিয়তাকে সদ্যমুক্ত নেতারা একটি সুষ্ঠু রূপ দিয়ে তার পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হবেন সতীশ সরকার, সুশীল দেব প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত নেতাদের লেনিন, ষ্টালিনের সমপর্যায়ের নেতা বলে আমরা মনে করতাম অথবা ঐ ভাবে চিন্তা করে আনন্দ পেতাম।

ঐতিহাসিক ২১শে নভেম্বর

যুদ্ধোত্তর কালের অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে উপমহাদেশে। মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের দানা বাঁধছে। স্বাধীনতার প্রশ্নে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। চেয়ে আছে সবাই সদ্যমুক্ত জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের দিকে।

এমন সময় দেশবাসী অবাক বিস্ময়ে শুনতে পেল যে রাসবিহারী বসু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আজাদ-হিন্দ-ফৌজের বিচার শুরু হয়েছে দিল্লীর লালকেল্লায়। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের জন্য উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন সারা দেশের মানুষ। ভারতের বিভিন্ন নগরে প্রান্তরে পালিত হল আই. এন এ. দিবস। সেনানীদের মুক্তির দাবীতে অগণিত জনতা নেমে আসে লড়াই এর ময়দানে। গতিবেগে চঞ্চল ভারতবর্ষ।

এমন সময় বঙ্গীয় ছাত্র ফেডারেশন (.৮ নং মির্জাপুর ষ্ট্রিট) আই এন. এর তিন সেনানী শা-নোওয়াজ, সেগল, ধীলনের বিচারের প্রতিবাদে ও মুক্তির দাবীতে ২১শে নভেম্বর (১৯৪৫) ছাত্র ধর্মঘট এবং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কেন্দ্রীয় সমাবেশের ডাক দেয়

বেলা প্রায় ১টা। রিপণ কলেজের ধর্মঘটী কয়েকশ ছাত্র মিছিল করে এগিয়ে চলেছে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দিকে মিছিলটি পূরবী সিনেমার সামনে পৌছতেই কয়েকজন বন্ধু অনুরোধ করল আমাকে ফিরে যাওয়ার জন্য। গতিবিধির নিয়ন্ত্রণাদেশ থাকায় এখান থেকে নিষিদ্ধ এলাকা শুরু কিন্তু ওদের কথায় কর্ণপাত না করে মিছিলের ভীড়ে ঢুকে পড়লাম। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এসে দেখলাম কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী সমবেত হয়েছে সেখানে মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন পরিচিত ছাত্রনেতারা। ঐদিকে না গিয়ে ভীড়ের মধ্যে গিয়ে বসে পড়লাম সাদা পোষাকের গোয়েন্দাদের দৃষ্টি যথাসম্ভব এড়িয়ে। আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীদের মুক্তির দাবীতে গর্জে উঠল কলকাতার ছাত্রসমাজ। সভা শেষে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল ডালহৌসী স্কোয়ারের দিকে কণ্ঠে তাদের গান, "কদম কদম বাড়ায়ে যা"। রাজপথ কাঁপিয়ে হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনি উঠল—চলো চলো দিল্লী চলো, চলো চলো ডালহৌসী। আজাদ্ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের মুক্তি চাই, নেতাজী জিন্দাবাদ।

মিছিল এগিয়ে চললে, ম্যাডান্ ষ্ট্রিটের মুখে পুলিশ বাধা দিল

কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার এসে জানালেন সামনে নিষিদ্ধ এলাকা, মিছিল যেতে দেওয়া হবে না। প্রতিবাদে হাজার হাজার ছাত্র রাস্তায় বসে পড়ল। প্রতিজ্ঞা ডালহৌসী যাবেই। অবরোধ না ওঠা পর্যন্ত ওখানে অবস্থান করবে।

এইভাবে প্রায় দুঘণ্টা কেটে গেলে কলকাতার ছাত্রদের রাস্তায় অবস্থানের কথা ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ল। বিভিন্ন পাড়া ও কলেজ হোষ্টেলগুলি থেকে যুবক ও ছাত্ররা যোগ দিতে লাগল অবস্থানকারীদের সঙ্গে। অফিস ফেরত অগণিত মানুষও ছাত্রদের সঙ্গে রাস্তায় বসে পড়ল। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। সাদা পোশাকে পুলিশের গোয়েন্দাদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। কয়েকজন বন্ধু একপ্রকার জোর করে উঠিয়ে দিল নিয়ন্ত্রণাদেশ ভঙ্গের অভিযোগে গ্রেপ্তার এড়াবার জন্যে।
সেখান থেকে বেরিয়ে হাটতে হাটতে বৌবাজার স্ট্রীটে এসে ২ নং বাসের দোতলায় উঠে বাড়ী চলে আসি মনে ভীষণ উত্তেজনা। ঘুরতে ঘুরতে সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে রাত্রি প্রায় ৮টার সময় দেখা হল ছাত্রনেতা আর. সি. পি. আই. এর নিরঞ্জন সেনগুপ্তের সঙ্গে। ওর কাছ থেকে জানতে পারলাম যে পুলিশ প্রথমে ছাত্রদের উপর লাঠি চার্জ করার পর ঘোড়সওয়ার ছুটিয়ে দেয়। লাঠির ঘায়ে অগণিত ছাত্র রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়ে রাজপথে। একটু পরে চলে গুলি। গুলিতে ছাত্রকর্মী রামেশ্বর ও আর একজনের দেহ ঢলে পড়ে ধর্মতলার পথে। ওর কাছ থেকে আরও জানলাম ছাত্ররা ফিরে যাবে না। সারারাত্র রাস্তায় বসে থাকবে দাবী না মেটা পর্যন্ত। একটু পরে নিরঞ্জনও আবার সেখানে যাবে কয়েক জায়গায় খবর পৌছে দেওয়ার পর।
আর কিছু চিন্তা না করে বাড়ীতে এসে গায়ের চাদরটি নিয়ে বাসে উঠে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নেমে ছুটে চললাম ধর্মতলার দিকে এসে দেখলাম যে বিকেলের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী মানুষ বসে আছে রাস্তায়।

একটু রাত্রির দিকে বাংলার চাট সাহেব 'মঃ কেসী এসে অনুরোধ জানালেন ছাত্রদের ফিরে যাবার জন্য। ছাত্ররা ঘৃণার সেই সঙ্গে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। উপস্থিত ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কেসীকে অনুরোধ জানালেন মিছিলটিকে অন্ততঃ কার্জন পার্ক পর্যন্ত যাবার অনুমতি দিতে। কেসী রাজী হলেন না আলোচনা ভেঙে গেল। এই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রাধাবিনোদ পাল, কংগ্রেস নেতা কিরণ শঙ্কর রায় ও বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ। আশ্চর্য ও বেদনাদায়ক ঘটনা হল যে সেই সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা নেতাজীর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুর অনুপস্থিতি।

ছাত্ররা বার বার তাঁর কাছে অনুরোধ জানালেন ঘটনাস্থলে একবার আসবার জন্যে। কিন্তু না এসে উডবার্ণ পার্কের বাড়ীতে বসে বাণী পাঠালেন ছাত্ররা যেন উচ্ছৃঙ্খল আচরণ বন্ধ করে শৃঙ্খলার সঙ্গে ঘরে ফিরে যায়। জবাবে ছাত্রদের তরফ থেকে নিরঞ্জন সেনগুপ্ত ঘোষণা করল যে শ্রদ্ধেয় নেতার উপদেশ মত ছাত্ররা শৃঙ্খলা মেনে নেবে ঠিকই কিন্তু তা ঘরে ফিরে যাবার জন্য নয়, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এগিয়ে চলার জন্য। ছাত্ররা আবার কয়েকজন নেতা মারফত অনুরোধ করল তাঁকে একবারের জন্য ঘটনাস্থলে আসতে। মাঝ রাত্রে জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী এসে জানালেন যে শরৎবাবু আসতে রাজী নন। সারা রাত হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী বসে রইল ধর্মতলার পথে। কণ্ঠে তাদের গান: কদম কদম বাড়ায়ে যা···ও নানা রণধ্বনি।

২২শে নভেম্বর: উত্তাল জনতরঙ্গে উদ্বেলিত রাজপথ

পরের দিন ভোর সাড়ে চারটা। শহীদ রামেশ্বর ও আবদুস সালামের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অবস্থানকারী ছাত্ররা এক মিনিট নীরবতা পালন করল। পরের দিন সংবাদপত্রে গুলি চালনার ফলে দুইজন ছাত্রের মৃত্যুর খবর জেনে কলকাতার মানুষ আবেগে থর থর করে কাঁপতে লাগল। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ হয়ে গেল ট্রাম, বাস, দোকান, অফিস, আদালত। লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে যোগ দিল

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কেন্দ্রীয় সমাবেশে। সভা শুরু হল ছাত্রনেতা গৌরী সেনের সভাপতিত্বে। সমস্ত দলের পতাকা উড়ছে। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টানের ভেদাভেদ মুছে গেছে সাম্রাজ্যবাদের বুলেটের আঘাতে।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার মালিক সুরেশচন্দ্র মজুমদার, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির নেতা শিবনাথ ব্যানার্জি, আর. এস. পি. নেতা সতীশ সরকার ও বিভিন্ন বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ। শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র বসু আসতে চেয়েও আসতে পারলেন না পুত্র অমিয় বসু বাঁধা দেওয়ার জন্য।

এমন সময় খবর আসল ধর্মতলা স্ট্রিটে আবার গুলি চলছে। দুর্বার গতিতে জনতা ছুটে চলল ধর্মতলার দিকে। পুলিশের লাঠি, গুলিকে উপেক্ষা ও মৃত্যুভয়কে উপহাস করে লক্ষ লক্ষ মানুষ এগিয়ে চলল।

"তখন তারা দীপ্ত বেগে বিজয় রথে
ছুটছিল বীর মত্ত অধীর রক্ত-ধূলার পথ বিপথে
তখন তাদের চতুর্দিকেই রাত্রিবেলার প্রহরে যত।
স্বপ্নে চলার পথিক মত।"

কর্ডন তুলে নিতে বাধ্য হল ইংরেজের পুলিশ। মিছিল এগিয়ে চলল ডালহৌসীর দিকে প্রথম পর্যায়ে ছাত্ররা জয়ী হল।

জনসমুদ্রে উঠেছে তুফান

২২শে নভেম্বর বিকাল। সূর্য পশ্চিম আকাশে অস্তমিত। রামেশ্বরের মৃতদেহ নিয়ে শোকযাত্রা শুরু হয়। চিত্তরঞ্জন এভিনিউ থেকে যতদূর দেখা যায় শুধু মানুষের মাথা। আক্ষরিক অর্থে সেদিন রাজপথে জনসমুদ্রের তুফান উঠেছিল। প্রায় দুই মাইল ব্যাপী লম্বা মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডঃ শ্যামপ্রসাদ মুখার্জি, ননী ভট্টাচার্য প্রভৃতি বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ। মিছিল এগিয়ে চলেছে। এমন সময় খবর এল যে জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী শোক মিছিলে

সময়ের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। ২১শে নভেম্বর তিনি সারারাত ধর্মতলার পথে ছাত্রদের সঙ্গে কাটিয়েছেন। এই অপ্রত্যাশিত মর্মান্তিক ঘটনায় চারিদিকে বিষাদের ছায়া নেমে আসে।

২৩শে নভেম্বর আবার জনতার উপর পুলিশের গুলি চললে রাস্তায় রাস্তায় শুরু হয়ে যায় জনতা ও পুলিশ-মিলিটারীর সঙ্গে সংঘর্ষ। বহু জায়গায় আন্দোলনকারী জনতা পুলিশ ও মিলিটারীর গাড়ীতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬। কলকাতা কর্পোরেশনে ২০ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট চলছে সেই সময়। ট্রাম. বাস, দোকান, অফিস সবই বন্ধ। পুলিশ পিছু হটতে শুরু করে ২৪শে নভেম্বব হাজার হাজার ছাত্র শহীদ আবদুস্ সালামের মৃতদেহ নিয়ে শোকযাত্রায় বের হয় মোহাম্মদ আলী পার্ক থেকে

রসিদ আলী দিবস

আই. এন এর অন্যতম সেনানায়ক রসিদ আলীকে ইংরেজ সরকার সাত বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলে আবার কলকাতায় (১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬) ছাত্র ধর্মঘট ও কেন্দ্রীয় সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়। এবার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীনে ছাত্র ফেডারেশন ও মুসলিম লীগ ছাত্র সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে উক্ত ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলিও এতে সমর্থন জানায় আবার শুরু হয় ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে ধর্মতলার পথে ডালহৌসীর দিকে ছাত্রদের মিছিল ইংরেজ সরকার লাঠি চার্জের পর বহু ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ-মিলিটারীর সঙ্গে সংঘর্ষে বহু মানুষের মৃত্যু হয়। জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যায়। পরের দিন পুলিশ ও মিলিটারী তাণ্ডবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কেন্দ্রীয় সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়।

সেই দিনের বিশাল সমাবেশে বক্তৃতা করেন হোসেন শহীদ সারওয়ার্দী, গান্ধীবাদী নেতা সতীশ দাশগুপ্ত, শেখ মুজিবর রহমান (পরবর্তীকালের বঙ্গবন্ধু), সি. পি. আই. এর ছাত্রনেতা গৌতম

চট্টোপাধ্যায়, আর. এস. পি. আই. এর ছাত্রনেতা অমল রায় এবং বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ।

সারা ভারত সম্মেলন

অস্থায়ী প্রাদেশিক সাংগঠনিক কমিটি দলের এক বড় সংখ্যক সদস্যের আপত্তি সত্বেও দলের সর্বভারতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে লাগল।

এই সমস্ত সদস্যের বক্তব্য ছিল যে পার্টির প্রতিষ্ঠাতা নেতাদের মধ্যে এখনও অনেক বন্দী। নেতাদের অনুপস্থিতির সুযোগে সর্বভারতীয় সম্মেলন যদি অনুষ্ঠিত হয় সেটা হবে এক নীতিহীন সুবিধাবাদ।

অস্থায়ী কমিটির বক্তব্য ছিল যে নেতারা যদি আরও দীর্ঘদিন জেলে বন্দী থাকেন তবে কী দলের কাজ-কর্ম বন্ধ থাকবে? দলের আর একটি অংশ মনে করতেন যে এখনও পার্টির মধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশ্নে কিছু মত পার্থক্য থেকে গেছে। সাংগঠনিক কমিটির উচিত এই বিভিন্ন মতামতগুলি নিয়ে দলের অভ্যন্তরে খোলাখুলি আলোচনা শুরু করা। এইজন্য দলের আভ্যন্তরীণ মুখপত্র প্রকাশ করে সাধারণ সদস্যদের মধ্যে প্রচারের মারফত তাদের রাজনৈতিক চেতনার মান উন্নত করা। এবং ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি গণ সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করা। আলোচনা ও কাজের মাধ্যমে মতপার্থক্যগুলি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। ফ্রন্টের কাজের মাধ্যমে কর্মীদের যোগ্যতা বিচারের একটা মাপকাঠি তৈরী হয়ে যাবে।

একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এই কর্মপদ্ধতি অনুসরণের পর দলের নেতৃত্বের পদে যোগ্য কর্মী নির্বাচনও সঠিক হবে। আর একদিকে রাজনৈতিক মতপার্থক্যগুলি দূর হয়ে একটা ঐক্যমতে পৌঁছান যাবে অথবা সম্পূর্ণ ঐক্যমত না হতে পারলেও সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মেনে নিতে সবাই বাধ্য থাকবেন। ইতিমধ্যে সদ্যমুক্ত যোগেশ চ্যাটার্জি পার্টির সর্বভারতীয় সম্পাদক হিসাবে দিল্লীতে দলের সম্মেলন ডাকা হচ্ছে এই মর্মে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। যোগেশ চ্যাটার্জির এই

বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশের পর দলের সমস্ত গোষ্ঠীই অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিল্লীতে সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রস্তাব মেনে নেয়।

উত্তর প্রদেশের কয়েকটি জেলা ব্যতীত বাংলাদেশই পার্টির প্রধান শক্তিশালী কেন্দ্র। স্বভাবতই এ জায়গার প্রাদেশিক কমিটির নির্বাচন খুবই গুরুত্ব লাভ করে।

১৯৪৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতার কুমার সিংহ হলে প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সতীশ সরকারের নেতৃত্বে গঠিত অস্থায়ী সাংগঠনিক কমিটির তত্ত্বাবধানে জেলা সম্মেলনগুলি অনুষ্ঠিত হওয়াতে স্বাভাবিক কারণে তার একান্ত বশম্বদ ব্যক্তিরাই সম্মেলনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। নেতাদের অনুপস্থিতিতে যে ছাত্র-যুবকর্মীরা পার্টির গণভিত্তি গড়ে তুলেছিল সেই ছাত্রসমাজের কোন প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিল না।

দলের প্রাদেশিক কার্যকরী সমিতির নাম প্রস্তাবের সময় একজন প্রতিনিধি ঢাকার রাখাল ঘোষ ও তারাপ্রসাদ চক্রবর্তীকে প্রাদেশিক কার্যকরী সমিতিতে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য প্রস্তাব করলে তা অগ্রাহ্য হয়ে যায়। সেই যুগে দলের সাধারণ কর্মীদের কাছে প্রায় অপরিচিত নোয়াখালীর মাখন পালকে প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

প্রয়াত রাখাল ঘোষ ছিলেন পার্টির তাত্ত্বিক নেতাদের অন্যতম। ত্রিদি চৌধুরী, দ্বিজেন রায়, সতীশ সরকার প্রভৃতির সমপর্যায়ের নেতা। তাঁর তাত্ত্বিক জ্ঞান ছিল সর্বজনস্বীকৃত। তারাপ্রসাদ চক্রবর্তী ছিলেন ঢাকা জেলার দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত কর্মী।

দিল্লী সম্মেলন

১৯৪৬ সালের ১০ই মে থেকে ১৩ই মে পর্যন্ত দিল্লীতে পার্টির সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের প্রায় এক হাজার দর্শক ও প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এরপরই ছিল উত্তর প্রদেশের স্থান। বিহার এবং আসাম থেকেও কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিনিধিরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর প্রচুর বক্তৃতা করেন। বাংলাদেশ থেকেই বক্তাদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। উত্তর-প্রদেশের প্রবীণ বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ঝাড়খণ্ড রায়, রাম নারায়ণ উপাধ্যায় ও কেশব প্রসাদ শর্মা প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে ৪২-এর আন্দোলনে বাংলাদেশের পার্টির বিশেষ করে ছাত্রদের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। এর পরই উক্ত আন্দোলনে উত্তর প্রদেশের স্থান উল্লেখ করা হয়েছিল। ৪২-এর আন্দোলন এবং যুদ্ধের বছরগুলিতে সি. পি. আই-এর কার্য্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করে বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করেন।

জাতীয় পরিস্থিতির উপর গৃহীত প্রস্তাবের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল—ভারতের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে শীঘ্রই ভারত ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে। ভারতের স্বাধীনতা আসন্ন। প্রকৃতপক্ষে এই স্বাধীনতা হচ্ছে গ্রেটবৃটেন ও ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর মধ্যে একটি চুক্তি মাত্র। ভারতীয় জনগণের অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটবে না। এর পরই শুরু হবে ভারতবর্ষে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর প্রস্তাবে মূল বক্তব্য ছিল যে স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবের সাথে সহযোগিতার নীতি থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে। অবলুপ্ত তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অধীনস্থ পার্টিগুলিকে স্ট্যালিন কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতির লেজুড় হিসাবে ব্যবহার করে চলেছেন। এর মূল কারণ হচ্ছে স্ট্যালিনের "একদেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব" নীতি গ্রহণ। এ পরিস্থিতিতে আর. এস. পি. আই. সোভিয়েত ইউনিয়নকে আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবের অবিসংবাদী নেতা হিসাবে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

এই সমালোচনার বিরুদ্ধে কলকাতা ও ২৪ পরগণার কয়েকজন

প্রতিনিধি কিছু সংশোধনী প্রস্তাব আনলে বিপুল ভোটে তা অগ্রাহ্য হয়।

সম্মেলনের প্রস্তাবগুলি খবরের কাগজে প্রকাশিত হবার পর কলকাতা থেকে "চতুর্থ আন্তর্জাতিকপন্থী" বি এল পি. আই-এর ইংরেজী সাপ্তাহিকে আর এস পি আই-এর প্রস্তাবগুলিকে বিপুল অভিনন্দন জানায়। অনেক ত্রুটী ও সীমাবদ্ধতা সত্বেও দিল্লীর প্রথম সব ভারতীয় সম্মেলন মোটামুটি সাফল্যের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

যোগেশ চ্যাটার্জীকে পার্টির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে সতীশ সরকার, কেশব শর্মা প্রভৃতিকে নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়।

নেতাদের মুক্তি

দিল্লীতে সর্বভারতীয় সম্মেলনের তুই সপ্তাহ পরেই পার্টির প্রতিষ্ঠাতা নেতারা—মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, রবি সেন, প্রতুল গাঙ্গুলী, ত্রিদিব চৌধুরী, নরেন দাস, চারু রায় প্রভৃতি জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। নেতাদের অনুপস্থিতিতে সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই তাঁরা মনঃক্ষুণ্ণ ছিলেন। সত্যমুক্ত নেতারা দলের নেতৃত্বের মধ্যে যোগ্যস্থান পাবেন কিনা এই নিয়ে প্রবল গুঞ্জন শুরু হল।

রংপুর জেলা ছাত্র সম্মেলন

১৯৪৬ সালে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে লালমণিরহাটে রংপুর জেলা ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। লালমণিরহাটে প্রাক্তন কর্মী হিসাবে দলের নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে পরেশদার (গুহ) নির্দেশে সম্মেলনের এক সপ্তাহ আগেই এখানে চলে আসি। সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন সত্যমুক্ত রাজবন্দী ত্রিদিব চৌধুরী ও উদ্বোধক ছিলেন প্রয়াত অধ্যাপক সরোজ সেন। ছাত্রনেতা বদরুল হায়দার চৌধুরী ও পরিতোষ মৈত্র সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের দিন সকালবেলা নেতৃবৃন্দকে

লালমণিরহাট ষ্টেশনে বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয় জনসাধারণ বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানায়। তাঁদের থাকার নির্দিষ্ট স্থানে পৌছানোর কিছুক্ষণ পরই তাঁদের সঙ্গে দেখা করার জন্য সেখানে যাই। ত্রিদিব চৌধুরী নামের সঙ্গে ছিলাম ভীষণ ভাবে পরিচিত। তিনিও আমাকে নামে চিনতেন। চাক্ষুষ পরিচয় হল এই প্রথম। প্রথম সাক্ষাতেই সুদর্শন ত্রিদিব চৌধুরীকে দেখে আমার মনে হয়েছিল যেন একজন নির্লিপ্ত দার্শনিককে দেখছি।

বিকালের দিকে ছাত্রছাত্রী, যুবক, রেলওয়ে-কর্মচারী ও কয়েক হাজার কৃষকের এক বিশাল মিছিল শুরু হল সভাপতি ও উদ্বোধককে নিয়ে। সেই দিনের ঐ বিশাল মিছিল যে-কোন সর্ব-ভারতীয় নেতার কাছেই গৌরবের ছিল। সভাপতি অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং সুললিত ভাষায় এক দীর্ঘ লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন তৎকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকে মূল্যায়ন করে তিনি বলেন, সারা বিশ্বে, 'লেনিনপন্থী', 'স্ট্যালিনপন্থী' ও 'ট্রটস্কিপন্থী' এই তিনটি চিন্তাধারায় বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভাজন ঘটেছে। সভাপতি নিজের দলকে 'লেনিনপন্থী' হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন।

বি পি এস এফ থেকে এ বি এস সি

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন পরিবর্তিত হয়ে নিখিল ভারত ছাত্র কংগ্রেস নাম গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে অবশ্য ছাত্র ফেডারেশন নামেই কাজ চলছিল। সেই সময় এড্‌হক্ কংগ্রেসপন্থী ছাত্র নেতারা নিখিলবঙ্গ ছাত্র কংগ্রেস নামে একটি সংগঠন তৈরী করে এ আই এস সি-র অনুমোদন দাবী করে। বি পি এস এফ (১৮ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট) অথবা এড্‌হক্ কংগ্রেসপন্থী ছাত্র কংগ্রেস কোনটির বাংলাদেশের ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা আছে সেটা অনুসন্ধানের জন্য নিখিল ভারত ছাত্র কংগ্রেসের সভাপতি রাম

সুমের শুক্লা কলকাতায় আসেন। কয়েকদিন তিনি বিভিন্ন মহলে খোঁজ খবর করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনকে (১৮ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট) বাংলাদেশের ছাত্রদের সত্যিকারের প্রতিষ্ঠান হিসাবে অনুমোদন দিয়ে যান—একটি সর্তে যে যত শীঘ্র সম্ভব নিখিলবঙ্গ ছাত্র কংগ্রেস নাম গ্রহণ করতে হবে। ১৯৪৬ সালের জুন মাসের শেষে রিপন কলেজে ছাত্র নেতা ডাঃ কালীদাস বসুর সভাপতিত্বে বাংলাদেশের ছাত্রদের এক কনভেনশনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন নাম পরিবর্ত্তন করে নিখিল বঙ্গ ছাত্র কংগ্রেস নাম গ্রহণ করে।

নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ

১৯৪৬ সালের জুন মাসের শেষ দিকে একদিন বন্ধু নিখিল চৌধুরী আমাদের ঝামাপুকুর লেনের বাড়ীতে এসে জানালেন যে তাঁরা কয়েকজন ব্যক্তিগত উদ্যোগে ৭ বি খেঁচু চ্যাটার্জী লেনে কয়েকজন সদ্যমুক্ত প্রবীণ বিপ্লবীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের জন্য এক ঘরোয়া বৈঠকের আয়োজন করেছেন। ঐ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করলে মিটিং-এ যাবার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

সন্ধ্যার সময় গিয়ে দেখতে পেলাম ঘরটা ইতিমধ্যেই ভরে গেছে। ঐ দিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন রমেশ আচার্য, প্রতুল গাঙ্গুলী, মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ও আশু কাহালী। সেইদিন সভাতে কোন নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন না। আমরা প্রত্যেকেই নেতাদের কাছে নিজেদের পরিচয় দিলাম। সভায় উপস্থিত একজন আমাদের প্রথমেই পরিচয় করিয়ে দিলেন মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর সঙ্গে। মহারাজ আমাদের কাছে ছিলেন একটি বহুশ্রুত নাম। প্রথম সাক্ষাতে মনে হল যে একজন নিরীহ, সাধারণ বাঙালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোককে দেখছি মনে হতে লাগল—ইনিই কি সেই যিনি একদা ইংরেজের ত্রাস সৃষ্টিকারী কিংবদন্তীর নায়ক, ভারতের এক অবিসংবাদী বিপ্লবীনেতা? দু'ঘণ্টা পর এক অনর্বচনীয় আনন্দ নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হলাম।

নজীরবিহীন ২৯শে জুলাই

এই সময় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে এসেছিল ট্রেড ইউনিয়ন বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের মধ্যে আন্দোলনের এক বিরাট জোয়ার। সওদাগরী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও সরকারী কর্মচারী এই সময় নিজস্ব দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে সংগঠিত হতে শুরু করে। পরবর্তী সময়ে ব্যাঙ্ক কর্মচারীর আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা প্রভাত করের আবির্ভাব এ সময়েই হয়।

জুলাই মাসের প্রথম দিকে ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারীরা তাদের চাকরীর সর্তের উন্নতি ও অর্থনৈতিক দাবির ভিত্তিতে অনির্দিষ্ট-কালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেন। ইংরেজ সরকার কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া সম্বন্ধে কঠোর মনোভাব অবলম্বন করেন। জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ নেতারাও এ ধর্মঘটকে সমর্থন জানালেন না। দীর্ঘদিন ডাক ও তার বিভাগ বন্ধ থাকার জন্য ব্যবসা বাণিজ্য তথা সমাজজীবনে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। অবশেষে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC) এবং সমস্ত বামপন্থী দলগুলি সমবেতভাবে সারা দেশব্যাপী ২৯শে জুলাই (১৯৪৬) একদিনের বন্ধের ডাক দেয়। সেই ডাকে সর্বশ্রেণীর মানুষ এক অভূতপূর্ব সাড়া দেয়। সমস্ত দেশে ট্রেন, বাস, ট্যাক্সি, ট্রাম, হাতে টানা রিক্সা, হাট, বাজার, দোকান, কল-কারখানা, স্কুল, কলেজ, সওদাগরী প্রতিষ্ঠান, সরকারী দপ্তর সমস্ত কিছু নিশ্চল হয়ে পড়ে। সর্বভারতীয় নেতৃত্বের সমর্থনহীন ঐ বন্ধ দেখে অনেকেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। ১৯৪৫ সালের ২১শে নভেম্বর আজাদ্ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবীকে কেন্দ্র করে ১৯৪৬-এর ১৮ই ফেব্রুয়ারী নৌ বিদ্রোহ সংগঠিত হওয়া পর্যাস্ত এই উপমহাদেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল তারই সার্থক পরিণতি লাভ করে ২৯শে জুলাইয়ে এই সর্বাত্মক ধর্মঘটের মাধ্যমে। ঐ দিনই ধর্মঘটের সমর্থনে মৃণাল কান্তি বসুর সভাপতিত্বে মনুমেন্ট ময়দানে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতা

১৬ই আগষ্ট ও আমরা

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট দিনটিকে মুসলিম লীগ পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার দাবিতে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস হিসাবে ঘোষণা করে।

মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা খাজা নাজিমুদ্দিন ১৬ই আগষ্টের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'কে হিন্দুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হিসাবে গ্রহণ করার জন্য মুসলমান জনসাধারণের কাছে আবেদন জানান। বাংলাদেশের আইন সভায় বিরোধী সদস্যদের প্রবল বিরোধিতার মুখে দাঁড়িয়ে লীগ সরকার ১৬ই আগষ্ট ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করেন।

১৬ই আগষ্ট বিকেলের দিকে নানা ধরণের গুজব ছড়িয়ে পড়ে কলকাতায়। মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলিতে সংখ্যালঘু হিন্দুদের হত্যা করে বাড়ী ঘর দোকান লুট করার পর আগুন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হিন্দুদের ধর্মস্থানগুলির উপর ক্রমাগত হামলা হচ্ছে। প্রাণ ভয়ে সর্বশ্রেণীর মানুষ দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

১৭ই আগষ্ট বেলা বারটা নাগাদ আমরা কয়েকজন মিলে দাঁড়ালাম আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও কেশব সেন ষ্ট্রিটের মোড়ে। গিয়ে দেখি বিরাট এক জনতা জড় হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখতে পেলাম একটি বিশাল মিছিল বিরাট বিরাট সবুজ পতাকা হাতে নিয়ে লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান, ছিনকে লেঙ্গে পাকিস্থান, পাকিস্থান জিন্দাবাদ প্রভৃতি রণ-হুঙ্কার দিতে দিতে রাজাবাজারের দিক থেকে এগিয়ে আসছে। ঐ মিছিলে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ ছিল শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষ। কেশব সেন ষ্ট্রিটের মুখে বিশাল জনতা দেখে তারা দাঁড়িয়ে পড়ে।

অল্পক্ষণ পরেই রাজাবাজারের মিছিলের দিক থেকে এপারের জনতার উপর প্রচণ্ডভাবে ইটপাটকেল পড়তে থাকে। সঙ্গে চলে রণধ্বনি আল্লা হো-আকবর, পাকিস্থান জিন্দাবাদ। এদিকের জনতাও বোধহয় প্রস্তুত ছিল। তারাও বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়ে ইট পাথর ছুঁড়ে তাদের জবাব দেয়। কিছুক্ষণ পরেই রাজাবাজার থেকে ছুঁড়ে মারা একটী বোমা প্রচণ্ড শব্দে এপারে এসে ফেটে যায়। এরপর এদিকের জনতা লাঠি, বল্লম, বর্শা নিয়ে প্রচণ্ড বেগে পাল্টা আক্রমণ করলে মিছিলকারী জনতা অনেকটা পিছিয়ে পড়ে। প্রায় দেড় ঘণ্টা যাবত আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের পর মিছিলটি ক্রমে রাজাবাজার দিকে অদৃশ্য হতে থাকে। এই দিন প্রশাসন আক্ষরিক অর্থেই ছিল নিষ্ক্রিয়। একটা পুলিশের গাড়ীও রাস্তায় দেখা যায় নি।

পৈশাচিক উল্লাসে

বিকালের দিকে খবর ছড়ালো যে হিন্দু সম্প্রদায়ও পাল্টা আক্রমণ করতে শুরু করেছে। তারাও হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে মুসলমানদের বাড়ীঘর ও দোকানে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে ফলে বহু মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। ক্রমে সন্ধ্যা নেমে এল, রাস্তা জনশূন্য। ইতিমধ্যে সান্ধ্য আইন জারী হয়ে গেছে। পাড়ার সমস্ত বাড়ীতে দরজা-জানলা বন্ধ করে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় মানুষ প্রহর গুণছে। কিছু যুবক রাস্তায় দাঁড়িয়ে পাড়া আক্রমণ হলে তার প্রতিকারের বিষয় আলোচনা করছিল।

একটু রাত্রি হলে কয়েকজন যুবকের সঙ্গে বাড়ীর পিছনের গলি দিয়ে অতি সন্তর্পণে হাঁটতে হাঁটতে কেশব সেন স্ট্রিটের উপর একটী বাড়ীর ছাদে এসে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরই শুনতে পেলাম দূর থেকে ভেসে আসা আল্লা-হো-আকবর এবং পরক্ষণেই বন্দে-মাতরম ধ্বনি। দেখতে পেলাম রাজাবাজার ও মেছুয়া বাজারের দিকে অগ্নির লেলিহান শিখা এবং শুনতে পেলাম বিপন্ন মানুষের করুণ আর্তনাদ। বেশীক্ষণ এ দৃশ্য সহ্য করেত না পেরে বাড়ী ফিরে এসে এই আত্মঘাতী দাঙ্গা প্রতিরোধে আমার অক্ষমতার কথা চিন্তা করে

মর্মবেদনায় জর্জরিত হতে লাগলাম। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলন যুক্ত হলে হিন্দু মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে বন্দেমাতরম্ ও আল্লা-হো-আকবর ধ্বনি দিয়ে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেন। অসংখ্য বিপ্লবী বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়ে ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন। আজ ঐ একই ধ্বনি দিয়ে হিন্দু মুসলমান ঝাঁপিয়ে পড়েছে পরস্পরকে হত্যার এক পৈশাচিক উল্লাসে। কেন ইতিহাসের এই বিস্ময়কর পরিণতি? এক নাগাদে তিনদিন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি চলার পর চারদিনের দিন ইংরেজ সরকার অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে রাস্তায় সেনাবাহিনী নামিয়ে দিলে দলবদ্ধ লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, পাইকারী হত্যা কিছুটা বন্ধ হয়। কিন্তু চোবাগুপ্তা হত্যা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। এই তিনদিনে উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় দশ হাজার লোক নিহত হয়েছিল।

ক্রমে অফিস আদালত বাজার দোকান প্রভৃতি খুলতে শুরু করলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কিছুটা স্বাভাবিক হয়। বহুদিন বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার পর তাদের খোঁজ খবরের জন্য রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। আমহার্ষ্ট স্ট্রীট ধরে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে এসে দেখতে পেলাম যে পার্কের চারদিকের রেলিং এর লোহার শিক একটিও নেই। সবই খুলে নিয়েছে দাঙ্গার হাতিয়ার হিসেবে। কলেজ স্কোয়ারেও প্রায় একই অবস্থা দেখলাম। কলেজ ষ্ট্রীট ধরে কিছুটা এগিয়ে মেডিকেল কলেজের কাছে ছোট্ট মসজিদটা প্রায় ভাঙ্গাচূড়া অবস্থায় দেখতে পেলাম। মসজিদটির দেওয়ালে অনেক জায়গায় বড় গর্ত করা রয়েছে। ঐ রকম একটি গর্তের উপর লেখা ছিল, এখান হইতে আল্লা পলাইয়া গিয়াছে।

চোরাগুপ্তা হত্যা চলতে থাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীসহ উভয় সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ মানুষ যে যার সম্প্রদায়ের মধ্যেই

জীবনযাত্রা সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হন। প্রকৃতপক্ষে এই মহানগরী হিন্দুর কলকাতা ও মুসলমানের কলকাতা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

অবশেষে নানা ঘটনার দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মাধ্যমে পণ্ডিত নেহেরুর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি দেশ ভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর পরই বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব বিভাগের দাবীতে আন্দোলন সোচ্চার হয়ে উঠলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃত্ব সেই দাবী মেনে নিতে বাধ্য হন। আন্তর্জাতিকতাবাদী ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দ্বিজাতিতত্ত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করে নীতিগতভাবে পরাজিত হল।

১৫ই আগষ্ট ও আমি

অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল। সেই সঙ্গে খণ্ডিত হল বাংলাদেশও। ১৫ই আগষ্ট বিকেলের দিকে কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তির পাদদেশে এক বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। হাজার হাজার মানুষ চলেছে গভর্ণর হাউসের দিকে। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে গভর্ণর হাউস সেদিন সর্বসাধারণের জন্য খোলা ছিল। ট্রামে, বাসে, লরীতে পায়ে হেঁটে অসংখ্য মানুষ ছুটে চলেছে সেই দিকে। কণ্ঠে তাদের বিজয় উল্লাস: বন্দে-মাতরম, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, স্বাধীন ভারত কি জয়। ট্রামে, বাসে যাত্রীদের নিকট থেকে ১৫ই আগষ্ট (১৯৪৭) কোন ভাড়া নেওয়া হয়নি।

চতুর্দিকে এক উৎসবের আবহাওয়া। আমি কিন্তু পারছিলাম না জনসাধারণের সঙ্গে ঐ আনন্দোৎসবে যোগ দিতে। কেবলই মনে হচ্ছিল আপোস এবং দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে যে খণ্ডিত স্বাধীনতা এল তার ভবিষ্যৎ রূপ কি হবে? আজ সকালেই মা বলেছিলেন, অল্প বয়সে দেখেছিলাম বঙ্গভঙ্গ রোধ করতে গিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন

শুরু আর বৃদ্ধ বয়সে দেখতে হলো সেই বঙ্গভঙ্গকে স্বীকার করেই স্বাধীনতা আন্দোলন শেষ। এসব ভাবছি এমন সময় এক পুরানো পরিচিত স্বাধীনতা-সংগ্রামী সামনে এসে দাঁড়ালেন। ১৯৩০-৩২ সালে আইন অমান্য করে জেলে ছিলেন অনেকদিন। জিজ্ঞাসা করলেন কেন আমি গভর্ণর হাউসে না গিয়ে চুপচাপ বসে আছি। উত্তরে বললাম, এই আনন্দোৎসবে যোগ দেওয়ার কোন উৎসাহ বোধ করছি না। তিনি বললেন, ১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে বেআইনী ঘোষিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন কার্জন পার্কে নেলী সেনগুপ্তার সভানেতৃত্বে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়ে শুরু হলেই ঘোড় সওয়ার পুলিশ প্রচণ্ডভাবে লাঠি চার্জ আরম্ভ করে দেয় সমবেত জনতার উপর। লাঠির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করাব জন্য দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়াতে শুরু করে দিই বহু লোকের সঙ্গে, দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ হোঁচট্ খেয়ে পড়ি গভর্ণর হাউসেব সামনে। ঠিক তক্ষুনি এক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্জেণ্ট হাণ্টার দিয়ে নির্দয়ভাবে পেটাতে শুরু করে। আজ বহু বৎসর পর প্রাণভরে বহু মানুষের সঙ্গে সেই বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে গভর্ণর হাউসের মধ্যে ঢোকার সময় মনে হলো যে সেই পুলিশ সার্জেণ্টের উপর যেন কিছুটা প্রতিশোধ নিতে পারলাম। এই গল্পটি বলে তিনি চলে গেলেন। আমার মনে হলো যে আমি এবং আমার মতো বহু মানুষ আজকের এই আপোষের মধ্য দিয়ে পাওয়া স্বাধীনতার দুর্বলতা এবং দেশভাগজনিত বিশ্বাস-ঘাতকতার দিকটা বড় করে দেখলেও দেশের অগণিত জনতা ১৫ই আগষ্টকে তাঁদের দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসাবেই গ্রহণ করেছেন।

তবু ভুলতে পারছিলাম না যে আমার আবাল্য পরিচিত ঢাকানগরী, প্রাণের অধিক হাঁসাড়া গ্রাম আজ থেকে বিদেশে পরিণত হল। ক্রমে সন্ধ্যা নেমে এল। কলেজ ষ্ট্রীটের ফুটপাতের দুইধারে গ্যাস লাইটগুলো জ্বলে উঠেছে। বন্ধুর জন্য আর অপেক্ষা না করে বিচ্ছিন্ন আমি, নিঃসঙ্গ আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম বাড়ীর পথে।

॥ পরিশিষ্ট ॥

গণআন্দোলনের অনভিজ্ঞতা

১৯৪৫ সালের ২১শে থেকে ২৩শে নভেম্বর পর্য্যন্ত কলকাতায় যে অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছিল তার নেতৃত্ব দিয়েছিল প্রধানতঃ বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন (১৮নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট)। এরপর থেকেই দলে দলে ছাত্ররা আসতে শুরু করে ছাত্র ফেডারেশন অফিসে পরবর্তী কর্মসূচী জেনে নেওয়ার জন্য। আর এস পি আই-এর ছাত্র কর্মীদের বয়স ছিল প্রত্যেকেরই ২০ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। সেই সময় কর্মীরা প্রায়ই ছুটে যেত নবগঠিত অস্থায়ী প্রাদেশিক সাংগঠনিক কমিটির কাছে কর্মসূচী কি নেওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করতে। বেশীর ভাগ সময়ই হতাশ হতে হয়েছে নেতৃত্বের কাছে সঠিক কোন নির্দেশ না পাওয়ার দরুণ।

এর কারণটা অবশ্য উপলব্ধি করতে পেরেছি বেশ কিছুদিন পর। এই সমস্ত নেতারা দীর্ঘদিন যাবৎ রাজনীতির মধ্যে থাকলেও সেটা ছিল গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের রাজনীতি। গণআন্দোলন সম্পর্কে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা তাঁদের ছিল না। রাজনৈতিক শিক্ষায় যথেষ্ট শিক্ষিত হলেও সেটা ছিল নেহাতই বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন পুঁথিগত শিক্ষা।

ছাত্র ও যুব কর্মীরা অচেতনভাবে হলেও ৪২-এর আগষ্ট থেকে শুরু করে যুদ্ধোত্তরকালের গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে দলের গণভিত্তির সৃষ্টি করেছিল নেতৃত্ব তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি।

ঐ সময়টা নেতাদের দেখিছি গণ-আন্দোলন সম্পর্কে কোন চিন্তা ভাবনা না করে কেবল আন্তর্পার্টি দ্বন্দ্ব নিয়ে লিপ্ত থাকতে।

দলে ভাঙ্গন

দলের প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠাতা নেতাদের অনুপস্থিতিতে সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য নেতৃবৃন্দ কিছুটা মনঃক্ষুণ্ণ হলেও মুক্তি লাভের পর তাঁদের যদি দলের নেতৃত্বে একটি সম্মানজনক স্থানে রাখা হতো তাহলে বোধ হয় ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতালাভের পরমুহূর্তেই দলে ভাঙ্গন দেখা দিত না। দলের প্রথম সাধারণ সম্পাদক যোগেশ চ্যাটার্জী তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ স্বাধীনতার সন্ধানে বলেছেন—

"দুর্ভাগ্যের বিষয় বাংলাদেশের কারাগারে আবদ্ধ তরুণেরা দলবদ্ধভাবে এই প্রাচীন প্রধানদের বিরুদ্ধে এইরূপ প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল যে প্রাচীনদের চিন্তাধারা নাকি বর্তমান যুগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্তরের নেতাদের এই ঐক্য-নাশক আচরণ দলের পক্ষে মারাত্মক হয়েছিল।" ইতিমধ্যে আর এস পি আই-এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম নরেন দাস উদ্যোগ নিলেন আর এস পি আই-এর অবলুপ্তি ঘটিয়ে পুনরায় কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে মিশে যাওয়ার।

কয়েকজন নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের লেখা একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা "My Picture of Socialism" থেকে নানা উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে মিশে যাওয়ায় ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝাতে চেষ্টা করলে তাঁদের মতের তীব্র বিরোধিতা করি।

১৯৪৭ সালে দলের মজঃফরপুর সম্মেলনের কিছুদিন আগেই প্রতিষ্ঠাতা নেতাদের মধ্যে প্রবীণ বিপ্লবী মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, রমেশ আচার্য, প্রতুল গাঙ্গুলী, রবি সেন, নরেন দাস, কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত, আশু কাহানী, চারু রায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ সহ ১৪৮ জন সদস্য সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে আর এস পি আই থেকে পদত্যাগ করে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

এরপর আরও বহু সদস্য সংবাদপত্রে অনুরূপ বিবৃতি দিয়ে

দলত্যাগের ঘোষণা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে পার্টির নেতৃত্বে দক্ষিণ কলিকাতার শিবদাস ঘোষ, নীহার মুখার্জী প্রীতিশ চন্দ সহ প্রায় ত্রিশ জন পার্টি সভ্যের সদস্যপদ "স্ট্যালিনপন্থী" এই অভিযোগে বাতিল করে দেয়। এর প্রতিবাদে ২৪-পরগণা জেলার আর এস পি আই-এর তৎকালীন জেলা সম্পাদক সুবোধ ব্যানার্জী (প্রথম যুক্তফ্রন্টের শ্রমমন্ত্রী) সহ ২৪ পরগণা জেলার সকল সদস্যরাই পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন। পরবর্তীকালে এই গোষ্ঠীই এস ইউ সি নামে এক নূতন দলের সৃষ্টি করেন। বীরেন ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে কুমিল্লার বেশ কিছু কর্মী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে মেদিনী চৌধুরী. নরেশ চক্রবর্তী, বীরেন কুণ্ডু. ও ধীরেন চক্রবর্তী (ঠাকুরভাই) অন্যতম। পার্টির এই ভাঙ্গনের মূল কারণগুলি এভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

এই ভাঙ্গন কোন মৌলিক রাজনৈতিক মতাদর্শগত পার্থক্যের জন্য ঘটেনি। আগেই বলেছি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশ্নে যে মত পার্থক্যগুলি ছিল তা শুধু জেলের অভ্যন্তরে আটক নেতাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পার্টির অগণিত সভ্য-সমর্থকরা এই বিষয়ে ছিল প্রায় অন্ধকারে। মুক্তিলাভের পর নেতৃবৃন্দ কোথায় বিভেদ এই নিয়ে খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে মতপার্থক্যগুলি দূর করে একটা ঐক্যমতে পৌছানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি।

পার্টির তৎকালীন নেতৃত্বের সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে চলার মানসিকতা ও ভিন্ন মতের প্রতি সহনশীলতা একেবারেই ছিলনা।

স্বাধীন ভারতবর্ষের গণআন্দোলনের রূপ কি হতে পারে নেতারা তা নিধারণ করতে পারেন নি।

যে সময় দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ নেতাদের সম্বন্ধে একটা অর্ধসত্য প্রচারিত ছিল (যা মিথ্যার চেয়েও খারাপ) যে প্রবীণ বিপ্লবীরা মার্কসবাদে বিশ্বাসী নন। এটা ঠিকই যে আক্ষরিক অর্থে

তাঁরা হয়ত মার্কসবাদী ছিলেন না। আবার সেই সঙ্গে নেতারা মার্কসবাদের ভিত্তিতে পার্টিকে গড়ে তুলতে কোন বাধারও সৃষ্টি করেনি। বিপন্ন মানবতার কাছে মার্কসবাদের যে আবেদন আছে প্রবীণ নেতারা সেই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে বিচার করেছিলেন।

অন্যদিকে প্রবীণ নেতৃবৃন্দও সদ্য স্বাধীন দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতি কি হতে পাবে তার জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট সময় পর্যান্ত অপেক্ষা না করে অনেকটা ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অবিবেচনা-প্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কত যে বড় ভুল করেছিলেন পরবর্তীকালে ইতিহাসই তা প্রমাণ করেছে।

কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিতে যোগদানের পর অধিকাংশ কর্মী সহ প্রবীণ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ উক্ত দলের সঙ্গে নিজেদের সামঞ্জস্য করতে না পাবার দরুণ ক্রমশঃ নিষ্ক্রিয় হতে হতে একদিন বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেলেন। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন মহারাজা ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী। তিনি দেশ ভাগের পর পূব পাকিস্তানেই থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত সেই জায়গায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে যুক্ত থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ব্যাপারে এক বিরাট ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে যান।

ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির যান্ত্রিক চিন্তা পদ্ধতির দ্বারা পরিচালিত হওয়ার দরুণ মূল জাতীয় স্রোত থেকে তাঁদের বিচ্ছিন্নতা এবং কংগ্রেস সোস্যালিষ্টদের মার্কসবাদ ও গান্ধীবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রবণতার দরুণ এই দেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনেক ত্রুটি, বিচ্যুতি ও দুর্বলতা দেখা দেয়।

এরই বিকল্প হিসাবে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে এক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ১৯৪০ সালে আর এস পি আই-এর জন্ম হয় ভারতের মাটিতে মার্কসবাদ লেনিনবাদের সৃজনশীল প্রয়োগের

ঐতিহাসিক প্রয়োজন সাধনের জন্য। সেই যুগে আমি ও আমার মতো যারা এই দৃষ্টিকোণ থেকে আর এস পি আই কে দেখেছিলাম তাদের কাছে পার্টির এই ভাঙ্গন ছিল এক নিদারুণ বেদনাদায়ক ঘটনা।

দিবসান্তে আজ যেন মন

আজ দাঁড়িয়ে পিছনে ফিরে তাকালে মানসপটে স্পষ্ট ছবির মত ভেসে উঠে আট বছরের একটি বালক মায়ের সঙ্গে মিছিলে চলেছে— জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসের সভায় যোগদানের জন্য সমবেত কণ্ঠে গান গাইতে গাইতে

"চল্‌রে চল্‌রে চল্‌রে ও ভাই ··জীবনে আহবে চল"

১৯৩২ সালে জাতীয় মুক্তি অর্জনের দাবীতে অভূতপূর্ব গণজাগরণ এবং বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ আজও আমার স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল।

কৈশোর থেকে যৌবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত কেটেছে এক ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে। পনের বছর বয়সে এক অপরিণত মন নিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। দেখেছি দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ। জেলখানায় বসেও অনুভব করেছি আগষ্টে আন্দোলনের বিশালতাকে। দেখেছি পঞ্চাশের মন্বন্তর। গভীর রাতে ক্ষুধার্ত নরনারী শহরের পথে পথে "একটু ফ্যান দাওমা" বলে করুণ আর্তনাদ শুনে এর প্রতিকারে নিজের অক্ষমতার জন্য মর্মবেদনা অনুভব করছি।

আবেগে উচ্ছসিত হয়েছি ব্রহ্ম সীমান্তে কোহিমার রণাঙ্গণে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রাথমিক সাফল্যের খবর শুনে। প্রেরণা পেয়েছি জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সোভিয়েত নরনারীর এক অনন্য সাধারণ আত্মত্যাগের কাহিনী জানতে পেরে। আনন্দে উল্লসিত হয়েছি বলদর্পী নাৎসী বাহিনীর লালফৌজের কাছে আত্মসমর্পণের সংবাদে।

যুদ্ধ শেষে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছি ঐতিহাসিক গণ-আন্দোলনে। দেখেছি জাতীয় মুক্তি অর্জনের দাবীতে সোচ্চার, অশান্ত, উত্তাল এই উপমহাদেশকে।

অবশেষে বেদনাহতচিত্তে সজল নয়নে গ্রহণ করেছি বিভক্ত ভারত তথা দ্বিখণ্ডিত বাংলার বুকে ১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্টকে।

আমরা আজ এসে পৌঁছেছি বিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে। ইতিমধ্যে গঙ্গা, পদ্মা, শতদ্রু, ভলগা ইয়াং-সিকিয়াং দিয়ে অজস্র লহরী বয়ে গিয়েছে।

কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভের দিনে স্বাধীন জন্মভূমির যে রূপের চিন্তা করেছিলাম তা আজ পর্যবসিত হয়েছে রাতের স্বপ্নে। সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়ণের পথ আজও খুঁজে বেড়াচ্ছি।

" জীবনের প্রথম প্রভাতে
বিনাদ্বন্দ্বে বিনা প্রশ্নে উন্মুক্ত ছ'হাতে—
তীর্থ পথ মহাদীক্ষা করেছি গ্রহণ।
দিবসান্তে আজ যেন মন নাহি ভোলে সেই দীক্ষা"